

চান্দু ও কান্তকলা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

হাশেম খান

এডলিন মালাকার

এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম

সন্জীব দাস

সম্পাদনায়

মুস্তাফা মনোয়ার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নিবিশেষে সবার প্রতি সমর্মর্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূলক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

চারু ও কারুকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন ও জীবনধারা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। চারু ও কারুকলা শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাগ্রহণে যেমন- সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং হয়ে ওঠে সৃজনশীল। আশা করি চারু ও কারুকলা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশাদি প্রক্রিয়া ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

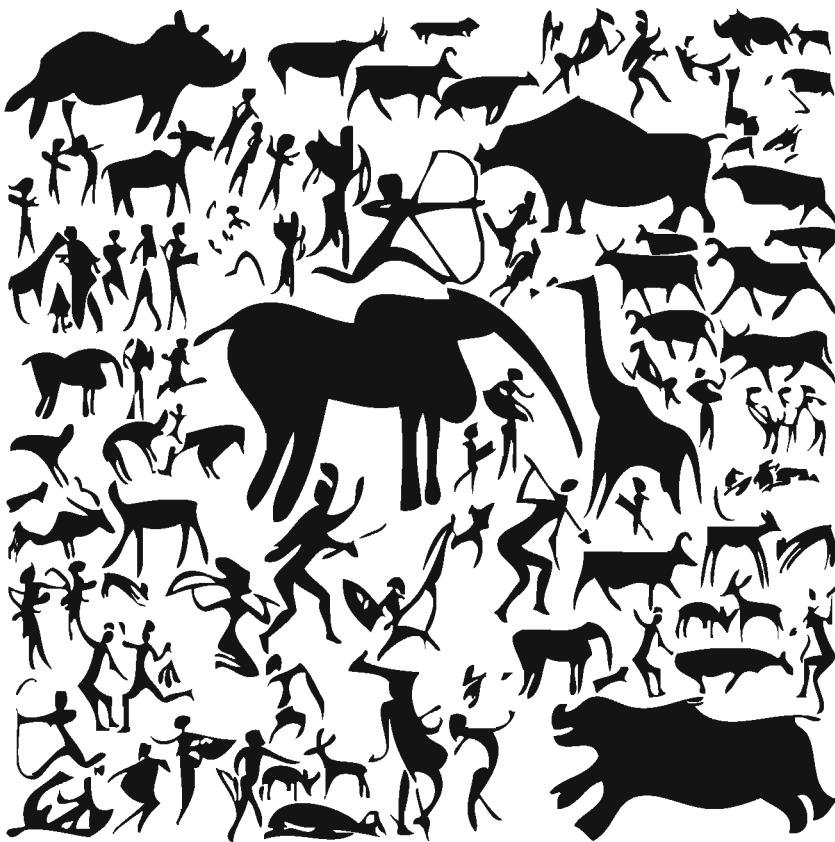
প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	শিল্পকলা	১-১০
দ্বিতীয়	দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম	১১-৩১
তৃতীয়	বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা	৩২-৪১
চতুর্থ	আঁকতে হলে জানতে হবে	৪২-৫৫
পঞ্চম	ব্যবহারিক শিল্পকলা	৫৬-৭৩
ষষ্ঠি	বাস্তব ও স্মৃতি থেকে অনুশীলন	৭৪-৭৯
সপ্তম	কারুকলা	৮০-১১২
	রঙিন ছবি	১১৩-১২০

প্রথম অধ্যায়

শিল্পকলা



আদিম গুহাবাসী মানুষের হাত ধরেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা-

- শিল্পকলার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম চারু ও কারুকলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

শিল্পকলা

শিল্পকলা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ধারণা পেয়েছে। শিল্পকলা বিষয়ে কিছু জানতে হলে প্রথমে এর উৎপত্তি বিষয়ে জানতে হবে। অর্থাৎ যখন থেকে গুহাবাসী মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে তোলে তখন থেকেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতা মানুষের মনে এক রহস্যময় অনুভূতির জন্ম দেয়। আদিম শিকারি মানুষ সে সব রহস্যের কূলকিনারা করতে না পেরে বিভিন্ন জানু বিশ্বাসে নির্ভরতা খুঁজেছে। সহজে পশু শিকার করার আশায় সেই জানু বিশ্বাস থেকেই গুহার দেয়ালে ধারালো পাথর বা পশুর হাড় দিয়ে খোদাই করে একেছে পশু শিকারের বা পশুর নানারকম ছবি। এ ছবিগুলোই পৃথিবীর প্রথম শিল্পকলা।

এরপর সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে তার আয়ন্তে এনে নিজের জীবনযাপনকে অনেক সহজ, সুস্মর ও সমৃদ্ধশালী করেছে। এভাবে যখন মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অনেক সহজ হলো তখন তার মনের কিছু কিছু অনুভূতি ও কল্পনা শক্তি একত্রিত হয়ে শিল্পিত রূপ নিল। যেমন তাষা আবিষ্কারের সাথে সাথে কবিতা, গঞ্জ এসেছে। পরে উচ্চ হয়েছে সংগীতের শিল্পকলা।

এই যে মানুষের মনের কল্পনা ও সূজনশীলতার মিশ্রণে যা তৈরি হলো-ছবি, কবিতা, গান এ সবকে আমরা নাম দিয়েছি শিল্পকলা।

এক কথায় বলা যায়, মানুষের মনের সূজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হচ্ছে শিল্পকলা।

কাজ : জানু বিশ্বাসই পৃথিবীতে আদিম গুহাবাসী মানুষদের শিল্পকলার সূচনা করে। এই কস্তব্যের স্বপক্ষে তোমার খাতায়
১০টি বাক্য লেখ।

পাঠ : ২

শিল্পকলার শ্রেণিবিভাগ

সামগ্রিক শিল্পকলা আসলে অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। বহু তার মাধ্যম। আমাদের কাছে বিষয়ের ব্যাপার এই যে, শিল্পকলার প্রায় সকল মাধ্যমেই শুরু করেছিল আদিম শিকারি মানুষের। বিষয়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন যুগের ‘হোমো সাপিয়েন্স’ মানুষ একেছে বিভিন্ন বন্যপশুর ছবি। তারা অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল। জীবজগ্নি সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান তাদের ছিল এবং পাথর কিংবা হাড়ের উপর নির্ভুল সুস্থু রেখা অঙ্কন করে তা ফুটিয়ে তুলতে পারত। তাদের আঁকা ছবি দেখে প্রতিটি কস্তুরী সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজগ্নির আকারে অঙ্কনরত মানুষের ছবিও আছে। মাথার উপর শিং এবং পিছনে লেজ পরিহিত মানুষের ছবি আছে। হরিগের সাজে সজ্জিত মানুষটি হরিগের অঙ্গাঙ্গক্ষেত্রে নকশ করে দুপা উপরে তুলে লাফ দিচ্ছে। তাদের আঁকা ছবি থেকেই জানা যায় যে, আদিম মানুষ শিকার করা পশুকে সামনে রেখে তার চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন অঙ্গাঙ্গক্ষেত্রে চিত্রকরণ করে লাফাতে লাফাতে আনন্দ প্রকাশ করত। সেখান থেকেই মানুষের নৃত্য-গীতির শুরু। শিকার করা বন্যপশুর লোমশ চামড়া, শিং, ইত্যাদি পরিধান করে তারা ঐ পশুর অনুকরণ করে ইঁটা, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদির অভিনয় করত। ধারণা করা হয় পশুর পালকে ধোকা দিয়ে

তামের সাথে যিশে থেকে সহজে শিকার করার কৌশল বিসেবে তারা এসব করত। সেখান থেকেই মানুষের অভিযন্তা পিছের শূরু। আদিগ আদিগ মানুষ এ সবই করতেই তাদের বীচার ভাগিলে, খাল্প সঞ্চারের প্রয়োজনে।

কাল : পুরাজ দেশালে আদিগ মানুষের জীবন পশুর হাতিশূলের আকৃতি ও অভিযন্তা অনেক নির্ভুল হিল। কী করলে তারা এক নির্ভুলতাবে জীবনকুম হবি আকতে পারত বলে স্মরি মনে কর, তা আতার দেখ।

পাঠ ১৩

শুধু হবি আকা নয়, অস্তর সুপের মানুষ মূর্তিও তৈরি করত। যাকে কো হব
তাকৰ্ব। সে সব ভাস্কুলের বেশিরভাবেই হিল মানুষের মূর্তি এবং আর সবই
নারীমূর্তি। আদিগ সমাজ হিল মানুষাকৃতি। যেরেরাই হিল সতেজ প্রথাম। মাকে
মনে করা হতো সতেজ আগি সম্ভা। অর্ধাং তার থেকেই সদের উত্তুব হয়েছে।
তাই মানুসবার প্রাচীক বিসেবে তারা এসব নারীমূর্তি তৈরি করাইল। কখনো
পাহাড়ের পায়ে আচুক কেটে আবার কখনো আলাদা পাখর কেটে তারা এগুলো
তৈরি করত। এছাড়া বাইসনের পিঁ, পশুর হাত কিলো পাখর আকৃতি দিয়ে পশু-
পাখির মূর্তিও তারা তৈরি করত। মানুষকম মৃৎপাত্র অর্ধাং মাটির তৈরি পাখ
তারা তৈরি করত এবং বিভিন্ন রকম হাতিশূলৰ তৈরি করে বাকে মানুষকম
করুকৰ্ব করত। এমনকি ঘাজের মেছুড়ের হাত, বিনুক ও হাতিশূলের মীত দিয়ে
গঢ়না বানিয়ে তা ব্যবহার করত আদিগ মানুষ। অর্ধাং কাহাশিজের সূচনাও তারা
করাইল। পশুর হাত, চামড়া, কাঠ, ধানড়া, পাখর কিলো কাপাদাটি দিয়ে শুরু
হব দুরবাঢ়ি তৈরিয় পথে প্রচেষ্টো। সেখান থেকেই আগত্যকলার শূরু। এভাবে
মানুষের অর্ধিত ও চর্চিত প্রিকলার দীর্ঘ সকল শাখার সুস্পণ্ড আদিগ মানুষের
হাতেই ঘটেছিল, যেমন— চিকিৎসা, কাহাশিজ, ভাস্কুল, মৃৎশিল, স্বাপত্যশিল,
নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয় এ রকম অনেক পিঁয় হাত্যাম।



নারীমূর্তি বা মানুসবা
ও উর্বরকলার প্রাচীক

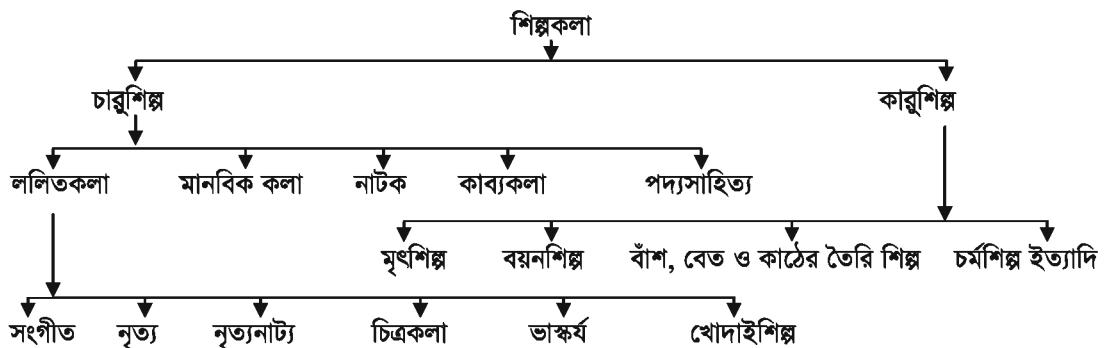
কাল : পুজা প্রেলিম নিকারীয়া ৫/৬ জন্মের এক একটি সনে তার হয়ে প্রতিষ্ঠল নিজেসের মধ্যে আলচনার মাধ্যমে খাতার
নিচের বকচিন হাত্যা দেখ।

আবক্ষের প্রিকলার দীর্ঘ সকল শাখার সূচনা আদিগ মানুষের হাতে।

পাঠ : ৪

অট্টম প্রেলিম আমরা জেনেছি যে, সমগ্র প্রিকলা মূলত প্রধান সূচি ধারায় বিভক্ত। একটি হচ্ছে চাহুশিল বা Fine Arts এবং অন্যটি হচ্ছে কাহুশিল বা Crafts. চাহুশিল কলতে আমরা সে সব প্রিকলেই বুবি বা মানুষের সূচনশীল মনের
স্বতন্ত্রস্বরূপ বহিত্বাকাশ। অর্ধাং সূচির আনন্দে মনের ভাগিনেই তার উৎপত্তি। আমাদের দূর্বল ও মনকে আনন্দ দেয়াই
তার উৎপেক্ষ। মানুষের মনের বালা অনুভূতি, সুখ, মৃখ, আনন্দ, বেসন্তা এবং আজ্ঞাও সামাজিক অনুভব থেকে চাহুশিল
সূচি হয়।

অন্যদিকে কারুশিল্প তৈরি হয়, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মাথায় রেখে। অর্থাৎ কারুশিল্প যদিও শিল্প তথাপি তা কেবল মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য বা দৃষ্টিকে আনন্দ দেবার জন্য তৈরি হয় না, এ শিল্প মানুষের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা কারুশিল্পের ব্যবহার করি। তবে মানুষের সৃষ্টি সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ শিল্পই চারুশিল্পের অঙ্গত। নিচে একটি ছকের সাহায্যে শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:



কাজ : ক্লাসের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে ললিতকলার বিভিন্ন শাখাগুলোতে বাহ্যিকভাবে তিনজন করে বিশিষ্ট শিল্পীর নাম লেখ। দেখা যাক কোন দল সবগুলো শাখার শিল্পীদের নাম লিখতে পারে।

পাঠ : ৫

বর্ণিত ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছ যে, শিল্পকলাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) চারুশিল্প

(২) কারুশিল্প।

চারুশিল্পকে আবার ললিতকলা, মানবিক কলা, নাটক, কাব্যসাহিত্য ও পদ্যসাহিত্যে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ললিতকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ। এই ভাগের কয়েকটি শাখা আছে। যেমন— চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাইশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্য।

অন্যদিকে শিল্পকলার অপর ধারা কারুশিল্পের শাখাগুলো হচ্ছে— মৃৎশিল্প, বুনন, তাঁতশিল্প, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি শিল্প, চর্ম বা চামড়ার তৈরি বিভিন্ন পণ্য, গহনা, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি শেল্পিক তৈজসপত্র, গৃহস্থালি সামগ্ৰী, হাতিয়ার ইত্যাদি। এ ছাড়াও কারুশিল্পের ধারায় তৈরি আরও কিছু শিল্প আছে, যেগুলোকে আমরা লোকশিল্পে চিহ্নিত করে থাকি। যেমন— পটচিত্র, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন খেলনা হাতি, ঘোড়া, মানুষ, পাখি। পোড়ামাটির ফলকচিত্র, নকশিকাঁথা, নকশি পাতিল বা শখের ইঁড়ি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছ যে, শিল্পকলার প্রধান দুই ধারার বিভিন্ন শাখা— প্রশাখা মিলিয়ে এর জগৎ অনেক বড় ও বিস্তৃত।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে শিল্পকলার প্রধান দুটি ধারা এবং এর শাখা প্রশাখাগুলো দেখাও।

पाठ : ६

शिरकला चर्ची पूर्णद

आदिम युक्तेर सेही वर्ण, लोग दाढ़ितवाळा पूर्ववासी मानवदेव आंका छविई पूर्वीव नवजयेप ग्रृहानो शिरकला ए वर्वा आमरा आसेही जेसेहि। वारा ए हविसुलो एकेहे, हाताव वाताव वज्र वाले तारा पूर्वी थेके विदाव नियोहे। विहू भादेव आंका हविसुलो एकेनो टिके आहे। आर शुद्ध टिके आहे वाले खून हवे। सेही नव हविसुलो, आदिम मानवदेव तैरि विठिन्न मृत्ति, गत व हातियार आमादेव सामले घेले थरे आहे इतिहादेर एक अजाना अद्याय। तेवे देख तर्फन तारा पर्वत आविष्कार हवलि, लिंगिं आविष्कार तो नुजेव वाचा। सुक्तां तर्फनकार घेसो लिंगिं इतिहास तो आर पाऊवा यावे ना। विहू आदिम पूर्ववासी से नव मानवदेव झीवन्यापन, आताव व्यवहार, गोपाक-परिज्ञन ए नव विहू ना जानले तो यानव आतिर इतिहास असर्वांग थेके वेत। लिंगिं इतिहास आमरा पाहिन वटे, विहू भादेव करा ऐसव शिरकर्मग्रृहोहि आज इतिहादेर स्वाक्षी। शिरकर्मग्रृहो देखे, जवि देखे आमरा आदिम मानवदेव जीवन संथाय, गोपाक-परिज्ञन, भादेव तिका, विदास सवाई जास्ते शेजाहि।

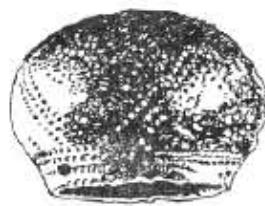
एतावे आदिम युक्तेर गारे ग्रृहानो अक्तर वृण वा ग्रृहानो गारेर वृण, सर्वून गार्वावेर वृण, कृविष्णु अड्डी सत्याकार सवालो गर्वावेही आमरा जेनेही मानवदेव कम्तुलात सत्कृतिय निर्दर्शन थेके। अर्धां ए सत्याकार मानव वे सर्वल हातियार, वासनपर्व, गोपाक-परिज्ञन, गर्वानपाट इत्यादि व्यवहार करत ता थेके। मानवदेव व्यवहृत ऐसव सामर्थीकेही एकेन आमरा कारुणिक वाले थाकि। सुक्तां देखा वाजेहे वे, मानव सत्याकार विल हात धरावरि करत अगिजाहे, ताहे वाले वर शिलेव व्यवह मानवसत्याकार समान। ए समस्त शिरकलाव माध्यमे आमरा मानवदेव सत्याकार इतिहासके जानते शेजाहि। ए वेवेही आमरा शिरकला चर्ची पूर्णद उपलब्ध करते गारि।

पाठ : ७

कोनो समाज, देश वा जातिर गरिचमके आमादेव सामले ज्ञाने थरे भादेव शिर व सत्कृति। शिर एकटि विशेष समरकेव थरे झाँवे। यार थेके आमरा ए समरवेर अनेक उपासानके शेजे याई। वेमन विश्वीर चिरकला। विश्वीरावा जवि जीकड मन्दिरे अध्याय शिरायितेर तित्तरा। शिरायित हजेह राजा, वास्ता वा बडुलोकदेव करत वर। विहू आनुष्ठित विशाल विशाल गार्वावेर तैरि विराट-विराट जगावि। एव तित्तराव



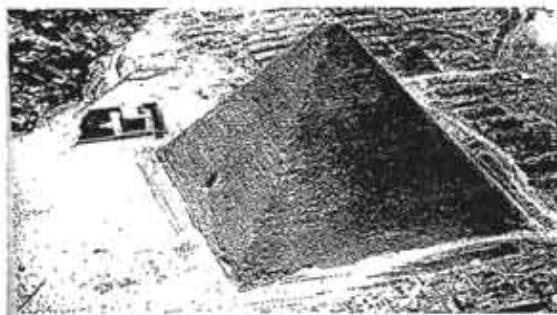
शिरकला



सवाचये ग्रृहानो मृणाल



सत्याकार 'चलचयन'



शिरकला नवजये वह शिरायित 'पिरी' उकडा ३८० फूट

দেয়ালে, মৃতের কফিনে, মন্দিরে মিশরীয়রা হাজার হাজার ছবি আঁকত। সবচেয়ে জায়গা ছবি দিয়ে ভরে দিত। একটুও ফাঁকা রাখত না। এসব ছবিতে কিছু কিছু গৃহপালিত জীবজগতুর ছবি থাকলেও বেশিরভাগই থাকত নারী, পুরুষ, রাজা, রানি ও দেব-দেবী। তাদের অধিকাংশ ছবিই গল্প বলা ছবি। অর্থাৎ ছবিগুলো দেখলেই এর ঘটনা বোঝা যায়। কখনো কখনো ছবির সাথে তাদের ভাষায় এর ব্যাখ্যাও থাকত। এসব ছবিগুলো দেখেই আজকে আমরা মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা জানতে পারি। এই সময়ে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজা-রানি, জনগণ ও তাদের জীবনযাত্রা, নিয়ম-কানুন, আচার-বিশ্বাস সবই বলে দেয় এই ছবিগুলো আর তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন কারুশিল্পসামগ্রী। পিরামিডগুলোও মিশরীয় স্থাপত্যের বিস্ময়কর নির্দশন। মূলত মিশরীয় শিল্পকলাই আমাদের সামনে তার অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হাজির করেছে।

কাজ : পিরামিড সম্পর্কে তোমার ধারণা-১০টি বাক্যে লেখ। পাশে পিরামিডের একটি ছবি আঁক।

পাঠ : ৮

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের চমৎকার নির্দশন আমরা হিসে এবং ভারতবর্ষেও পাই। মধ্যযুগের গ্রিস ও ভারতবর্ষের সাহিত্যকর্ম সারা বিশ্বের অহংকার। ইলোরা ও অজন্তার গুহাচিত্র প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। পালযুগের শুঁথিচিত্র বা মোঘল চিত্রকলা আমাদের সামনে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছুকেই প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি এই সময়ের বিভিন্ন ভাস্কর্য ও বিভিন্ন স্থাপনা অর্থাৎ স্থাপত্যশিল্প ভারতবর্ষের অহংকার।



অজন্তা গুহার দেয়ালে রিলিফ ভাস্কর্য

আগ্নার তাজমহল পৃথিবীর বিদ্যম। তাই শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতা এগিয়েছে মূলত মানুষের সৌন্দর্যবোধকে ক্ষেত্র করেই। গুহাবাসী মানুষ যখন গাছ, পাতা, পশুর হাড়, চামড়া, ডালপালা দিয়ে ঘর বানানো শিখল তখন থেকে স্থাপত্যকলা আজকের অবস্থানে এসেছে শুধু মানুষের নিত্যন্তুন সৌন্দর্যবোধের কারণে। মানুষ চেয়েছে তার তৈরি ভবনকে শিল্পিতরূপে দেখতে। তাকে আরো সুন্দর করতে। পোশাকের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু লঙ্জা নিবারণের জন্য আদিম মানুষের গাছের ছাল, পাতা বা পশুর চর্মইতো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকে নিত্যন্তুন ফ্যাশনের পোশাক আমরা পরিধান করছি। বাজারে গিয়ে আরও নতুন নতুন ডিজাইন খুঁজছি। এসবই শিল্পের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণে। নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য, মানুষের ঝুঁটি, সৌন্দর্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশে শিল্পকলার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি আঁকা ও শিল্পকর্ম যেমন-সংগীত, চলচ্চিত্র বা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে, মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। সমাজকে সুন্দর করার জন্য, সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য, আনন্দে থাকার জন্য এবং নিজেকে ও নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য ছবি আঁকা, শিল্পকর্মের চর্চা করা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথাটা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং তাঁর সাথীরা এ দেশের মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন বলেই আজ শিল্পকলার চর্চা আমাদের দেশে এত গুরুত্ব পাচ্ছে।

কাজ : শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে আমরা নিজের দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি। ছবি ও ভাস্কর্য ছাড়া শিল্পকলার আর কোন কোন মাধ্যমে, কীভাবে তা সম্ভব বলে মনে কর।

পাঠ : ৯

ছবি আঁকা বা অন্যান্য শিল্পকর্ম মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই খুব ছোটবেলা থেকে কোনো শিশুকে যদি ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়, তাহলে শিশু লেখাপড়ার উন্নতির সাথে সাথে তার ঝুঁটিবোধের জ্ঞান উন্নত করতে পারবে। সুন্দর কী ও অসুন্দর কী তা সহজে বিচার করে তার কাজে সুরুচির পরিচয় দিতে পারবে। ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে অনেকগুলো গুণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

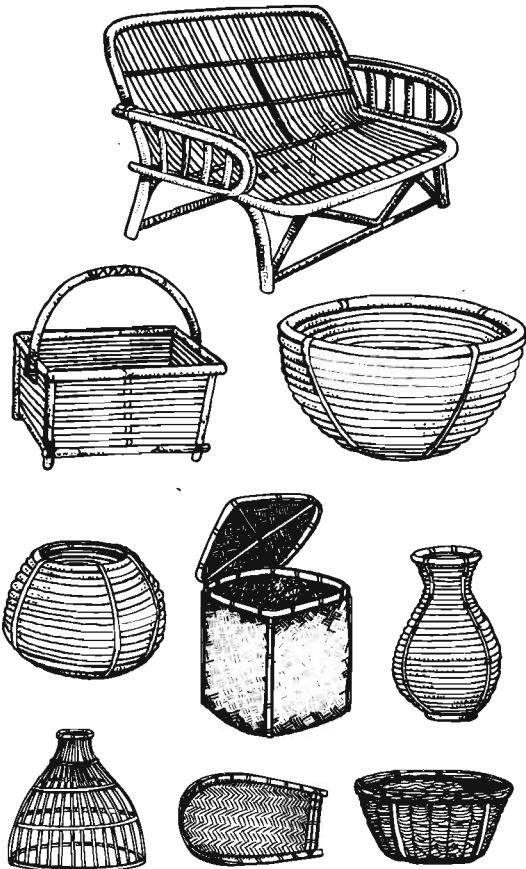
খাতার একটা ছোট কাগজে একটি শিশু যখন গ্রামের ছবি আঁকে তখন ঐ ছোট কাগজটিতে সে পুরো গ্রামের সবকিছুকে ধরতে চায়, যেমন—গ্রামের ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদী—নৌকা, মানুষজন, গরু, ছাগল, ফুল, পাখি সবকিছু। ছোট কাগজটিতে কোথায় ঘরবাড়ি হবে, গাছপালা কোথায় থাকবে, নদীটি কোথা দিয়ে বয়ে যাবে, নৌকা কয়টি থাকবে, কোথায় থাকলে ভালো লাগবে, নদীর পাড়ে ফসলের মাঠ, বাড়ির উঠানে গরু, মেয়েরা নদী থেকে পানি নিয়ে ফিরছে এ রকম অনেক বিষয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে শিশুটি গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ছোট একটা সাদা কাগজে এতবড় একটি গ্রামকে আঁকতে গিয়ে শিশুটির মধ্যে ছোট জ্ঞানগায় সীমিত পরিসরে সবকিছুকে সাজিয়ে রাখার, সুন্দর করে গুহিয়ে নেবার ও শৃঙ্খলাবোধের চর্চা হয়। এরপর রং করার ক্ষেত্রেও কোথায় কী রং দিলে সুন্দর হবে, প্রকৃতিতে কোনটির কী রং এসব নিয়ে শিশুটি ভাবে। এতে তার দেখার ক্ষমতা, চিন্তার শক্তি, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সবই বৃদ্ধি পায়। ফলে এভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে এক সময় তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, মানবিক গুণবলি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সুন্দর কাজ, ভালো কাজ করার ব্যাপারে সে উদ্যোগী ও সাহসী হয়ে গড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে সে কোনো দায়িত্বগ্রহণ করতে তায় পায়না। ধরা যাক সে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলো, যে প্রতিষ্ঠানে শত শত কর্মী কাজ করে। সে কিন্তু সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালাতে পারবে। যার যার কাজ ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা তার জন্য সহজ হবে। কারণ ছোটবেলায় ছবি আঁকা চর্চার মাধ্যমে এ গুণ সে আয়ত্ত করেছে। ছবি আঁকা খুব সহজে মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এজন্য উন্নত বিশ্বে বহু আগে থেকেই লেখাপড়ার অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ছবি আঁকাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাঠ : ১০

শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ : চিত্রকলা ও কারুকলা

সামগ্রিক শিল্পকলার জগতে চিত্রকলা বা ভাস্কর্য তৈরি এবং কারুকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের সমাজজীবনেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুকলার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। সমাজে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেসব কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা পেশা হিসেবে শিল্পকর্ম করে যাচ্ছে তা হলো গ্রামের পেশাজীবী কারুশিল্পীর কাজ; যেমন— কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, সুতার ও বাঁশ—বেতের কারুশিল্পী। মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, জায়নামাজ, শতরঞ্জি, পাথা ইত্যাদি ছাড়াও বুনন ও সূচিশিল্পের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বৎশ পরম্পরায় গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ সব শিল্পকর্মের চর্চা আছে। যাকে আমরা নাম দিয়েছি লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিশিল্প। বর্তমান আধুনিক জীবনযাপনে লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিশিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে।

আধুনিক জীবনযাপনে ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকার জন্য শিল্পী প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রকৌশলবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা স্থাপত্যশিক্ষায় নানারকম বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস, ভূগোল চর্চায় চিত্রশিল্পের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। টেলিভিশনের প্রতিটি অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য ডিজাইনার এর প্রয়োজন। নাটক, সিনেমা তৈরিতে সেট ডিজাইনার বা অঙ্কনশিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্য যেমন—বিমান তৈরিতে, জাহাজ নির্মাণে, মোটরগাড়ি, বাস, ট্রেন, টেলিভিশন, রেডিও, তেজসপত্র, তালা, চাবি, বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, বোতল, বৈয়ম, কোটা থেকে শুরু করে কলম, পেনসিল, ছুরি, কাঁচি বিভিন্ন আসবাবপত্রের সূন্দর চেহারা, রূপ ও গড়ন বা আকার-আকৃতি তৈরির জন্য চিত্রশিল্পীর একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের মোড়ক ও বিজ্ঞাপন, পোস্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপনী শিল্পের জন্য চিত্রশিল্পী প্রয়োজন। পোশাক বা ফ্যাশন ডিজাইনের জন্যও চিত্রশিল্পী ছাড়া চলে না। তাই শিল্পকলার চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং চিত্রকলা ও কারুকলার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প

পাঠ : ১১

ইতঃপূর্বের আগোচনায় আমরা শিল্পকলায় বিস্তৃত ও নানামুখী বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও কারুশিল্প হাজার বছর ধরে বিশ্বের শিল্প ভাস্তবকে সমৃদ্ধ করেছে। যেসব শিল্পকর্ম ও শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে জেনেছি। চীমাবুয়ে, জঙ্গো থেকে বতিচেলি, পেরুজীনো, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোসহ শুধুমাত্র ইতালিতেই জন্মেছিলেন বহু কালজয়ী শিল্পী, ভ্যাটিকান সিটিতে সিস্তিন গির্জার ছাদের নিচে বাইবেলের ঘটনাবলি নিয়ে মাইকেল এঞ্জেলো যে ছবি ঐকেছেন, তা বিশ্বশিল্পকে দিয়েছে অতুলনীয় সম্পদ। ছাদের নিচে মাচা বেঁধে টানা সাড়ে চার বছর চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে এ কাজ তিনি শেষ করেন। মাইকেল এঞ্জেলো মূলত ছিলেন খ্যাতিমান ভাস্কর। গির্জার ছবিটি যখন শেষ হলো তখন গোটা রোমের লোক ফেটে পড়ল তা দেখার জন্য। আজও সারা বিশ্বের হাজার হাজার শিল্পের মধ্যে সিস্তিন গির্জায় ঐ ছবি দেখার জন্য ছুটে যায়। আর একজন বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, তিনিও ইতালিতে জন্মান। তাঁর আঁকা মোনালিসা গৃথিবী বিখ্যাত। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস শহরের স্মৃতির মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে ছবিটি।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আর একজন হচ্ছেন রেমব্রান্ট। তাঁর বিখ্যাত ছবি রাতের পাহারা। বিখ্যাত অন্য একজন শিল্পী পল সেজান। তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখে মনে হবে ছবির মধ্যে ঢুকে আমরা তাঁর মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে বেড়িয়ে

পড়ি। তোমরা অনেকেই হয়তো ভ্যানগগ এর নাম শুনেছ। তাঁর জন্ম হল্যাণ্ডে। ফরাসি শিল্পী পল গার্স্যা ও ভ্যানগগ একসাথে কিছুদিন ছবি আঁকেন। তাঁরা দুজনেই চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিখ্যাত। আর এক শিল্পী মাতিস। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি—নাচ। বিশ শতকের সেরা শিল্পীদের অন্যতম হচ্ছেন—পাবলো পিকাসো। শিশু ও পায়রা, মা ও শিশু, স্বপ্ন, পায়রা, গুরোর্নিকা ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবি। অন্যদিকে আধুনিক ভাস্কর্যের জনক অগাস্টিন রান্ড্য এবং হেনরি মুরসহ বিভিন্ন ভাস্কররা তাঁদের ভাস্কর্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পের ভূবনকে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীরাও বিশ্বশিল্পে তাঁদের অবদান রেখেছেন। অবনীপ্রস্নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, আদুর রহমান চুখতাই, আমাদের দেশের জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম সুলতান, শফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীদের কাজেও চারুকলার ভূবন সমৃদ্ধ হয়েছে।

অন্যদিকে কারুকলাও সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ করেছে শিল্পকলার ভূবনকে।

বিশ্বশিল্পের এই বিশাল চিত্রকলার ভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ, এতবিখ্যাত সব শিল্পী আর শিল্পকর্ম রয়েছে যে সে সব এই স্বর্গ পরিসরে সিখে শেষ করা যাবে না। তাই অল্প কিছু শিল্পী ও শিল্পকলার নাম উল্লেখ করা হলো। বড় হয়ে, উপরের ক্লাসে উঠে বা ভবিষ্যতে কোনো সময়ে নিজেদের আগ্রহে তোমরা চিত্রকলার এই বিশাল ভাণ্ডার সম্পর্কে বিভিন্ন বইয়ে জানতে পারবে। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমগ্র শিল্পকলাকে প্রধানত—

ক. দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে

খ. তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে

গ. চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে

ঘ. সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে

২। আদিম মানুষের তৈরি বেশিরভাগ ভাস্কর্যই ছিল—

ক. পশু মূর্তি

খ. নরমূর্তি

গ. পাখির মূর্তি

ঘ. নারী মূর্তি

৩। পিরামিড হচ্ছে বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি—

ক. ত্রিভুজ আকৃতির মন্দির

খ. ত্রিভুজ আকৃতির সমাধি

গ. চতুর্ভুজ আকৃতির ভবন

ঘ. বিশাল পাথরের মূর্তি

৪। মাইকেল এঞ্জেলো হিলেন মূলত খ্যাতিমান—

ক. ভাস্কর

খ. চিত্রশিল্পী

গ. স্থপতি

ঘ. সংগীতশিল্পী

৫। সংগীত, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য হচ্ছে—

ক. মানবিক কলার শাখা

খ. লিলিতকলার শাখা

গ. কাব্যকলার শাখা

ঘ. পদ্য সাহিত্যের শাখা

৬। আদিম সমাজ ছিল—

ক. মাতৃতাত্ত্বিক

খ. পিতৃতাত্ত্বিক

গ. ভাতৃতাত্ত্বিক

ঘ. ভগ্নিতাত্ত্বিক

শিখে জবাব দাও

১. শিল্পকলা বলতে কী বুঝা? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকলা কী?

২. শিল্পকলার প্রধান দুইটি শাখা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. একটি ছক এঁকে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখাগুলো দেখাও।

৪. শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৬. সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভূমিকা বর্ণনা কর।

বিতীয় অধ্যায়

দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম



শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা ‘মইদেয়া’

এ অধ্যায় গাঠ শেষে আমরা-

- বিশ্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির সহস্রতির প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

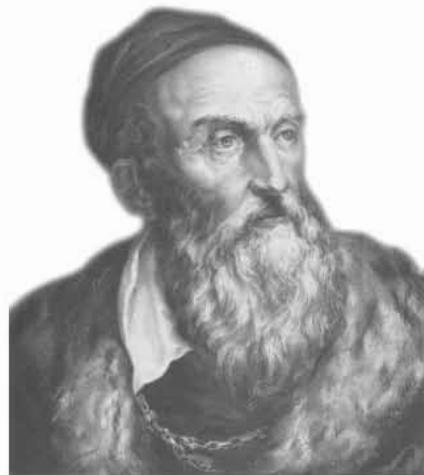
বিশ্বের কয়েকজন উত্তোলনযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম

পাঠ : ১

চিসিয়ান

(১৪৮৮-১৫৭৬)

ইতাগির আঙ্গস অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে চিসিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে কারণে সামাজিক ও সংস্কৃতিয়না পরিবার হিসেবে তাঁদের একটা খ্যাতি ছিল। শৈশব থেকেই চিসিয়ান ছিলেন ভাবুক ও কবি প্রকৃতির। এর কারণ ছিল জন্মস্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশ, পার্বত্য গ্রোত্বধারা, সুশোভিত পত্রপুক, গাইন বন, উন্মুক্ত আকাশ। এ সবকিছুই তাঁকে প্রভাবিত করেছে ছবি আকার অনুরূপী হতে, বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে আইনজ করতে। এ জন্য তাঁকে তেনিসে পাঠালেন। কিন্তু তিনি বস্তু উর্জনের কাছে কৃতি বছর বয়সে ছবি আকার প্রথম হাতেখাড়ি লেন।



শিল্পী চিসিয়ান

অঙ্গদিনের মধ্যেই চিসিয়ান নিজ প্রতিভা ও আভিজ্ঞাতের জন্য অভিজ্ঞত সমাজে নিজেকে চিরশিল্পী হিসেবে ভুলে ধরেন। প্রতিকৃতি ও কল্পাঞ্জিল উভয় প্রকার চিঙ্গেই চিসিয়ানের দক্ষতা ছিল। তেনিসিয়ান চিরশিল্পীদের মধ্যে চিসিয়ান ছিলেন সর্বপ্রথম এবং তিনি ইতালীয় অভিজ্ঞত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তা ছাড়া এই সময় শিল্পকলার জন্য ইতাগির ফোরেলের যেমন খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রস্থলে তেনিসেরও তেমনি মনেক্ষেত্র খ্যাতি ছিল। তেনিসে তিনি রাজকীয় শিল্পদপ্তীও ছিলেন। শিল্পীপ্রতিভা ছাড়াও মানুষ হিসেবেও চিসিয়ান ছিলেন অত্যন্ত সন্তু। নিজের জ্ঞান ও চিঙ্গের মান সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

রঞ্জের উপর ছিল চিসিয়ানের অসূচিত দক্ষতা, মাত্র ছুর মাস বয়সে চিসিয়ান মাতৃহীন হন আর সে কারণেই জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর অস্তরের এই হাতাকার গোপন করতে পারেন নি।

জীবনের শেষ সময়ে এসে Mother নামে বিখ্যাত চিরখানি অস্তরন করেন। তাঁর কলনা ছিল যিশুমাতা মেরীর মধ্যে নিজ মাঝের বিগত আত্মা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর মাঝে স্বপ্ন দেখতেন— মা যেন তাঁকে ডাকছে। তাই তো তিনি তাঁর বস্তু ও ছাত্রদের বলতেন। মা আমাকে ডাকছেন আমি শীঘ্ৰই তোমাদের হেড়ে চলে যাব।



শিল্পী চিসিয়ান এর আৰ্কা 'Mother'

করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মাতৃমূর্তি ছবিটি অঙ্কন শেষ হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে আরও আছে—

Dance and The Shower of gold, Bachus and Ariadne, Salome and head of John ইত্যাদি ছবিগুলো সভনের ইঞ্জিনিয়েল আর্ট গ্যালারিতে সংগৃহীত আছে।

কাজ : টিসিয়ানের Mother চিত্রটি সম্পর্কে লেখ।

পাঠ : ২

রেমব্রান্ট

(১৬০৬-১৬৬৯)

রেমব্রান্ট জনপ্রিয় করেছিলেন হল্যাডের শিক্ষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র লেয়েডেনে (Leyden) ১৬০৬ সালের ১৫ জুনাই। তাঁর পিতা ছিলেন বিভিন্নাংশী লোক। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র উচ্চশিক্ষা নিয়ে লেয়েডেনে একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠানাত্মক করবেন। কিন্তু রেমব্রান্টের এই গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষা ভালো লাগত না। পড়ার বইয়ে তিনি জীবজ্ঞান ছবি এঁকে রাখতেন। পিতা তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ১৩ বছর বয়সে জ্যকোব ভ্যান (Jacob Van) নামের একজন



শিশী রেমব্রান্ট



শিশী রেমব্রান্ট এর আমা 'ফ্রেনা'

স্থানীয় শিশীর নিকট প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে প্রতিকৃতি চিত্রকর Dieter Lastman এর নিকট কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৬২৪ সালে রেমব্রান্ট লেয়েডেনে ফিরে এসে একটি শিশী চক্র গঠন করে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

পৌঁছ বছর বয়সে রেমব্রান্ট অতি অন্ধ দিনের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুদৃঢ় প্রকৃতি চিত্রকর হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতি দ্রুত ব্যবসা জমে ওঠে, বছু চিত্রের ফরমায়েশ পেতে থাকেন এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও শিশীকে ফরমায়েশ দিতে থাকে। শুধু সুদৃঢ় এচার (etcher) মূল্যেও তাঁর কৃতিত্ব প্রচারিত হয়, প্রেইন্টিং নয় এটিং কাজেও রেমব্রান্টের অন্তর্ভুক্ত দক্ষতা ছিল।

২০
২০ রেমব্রান্ট একসময় মুঘল চিত্রের প্রতি আকৃত হয়ে ঐ পদ্ধতির অনেকগুলো চিত্র নকশ করেছিলেন, কিন্তু ঐগুলো মুঘল চিত্রের ব্যায় উন্মুক্ত হয়নি।

জহানি জগতের সদজ্ঞ সোখলি কোল্যাণি অম্বুজের খোকা শাহবাহাদের একলামি চিত্র শুধু খাঁস পৌরবোজল কৃতিত্বের অন্য ১,৭৫,০০০ টাকার ছয় করেন। তারচের মূল মূল্য চিত্র এর পক্ষাশে মূল্যেও কিন্তু হ্যানি।

চিত্র অভিনেত্র কেতু অম্বুজ হিসেব নির্ভীক ও আকৃতিত্বে। চিত্রের বিষাক্তত্বের সাথে আলোর নাটকীয়তাই তার চিত্রকে বৈশিষ্ট্য মান করেছে। বিন্যাসের সিক থেকে তিনি হিসেব মূল্যশীল। সমস্ত ছবির মধ্যে পক্ষীর চোন ও সপ্তিঙ্গ কল্পালিপিসের বর্ণ সজাতি তারসাথ রক্ষার শিল্পীর অনুভূত কর্মান্বেষ পরিমূল পাওয়া যায়।

অম্বুজ শুধু ব্যক্তির কর্মজীবনে এটি, ছবির ও প্রেরণে মিলিলে করেক বাজার চিত্র অভিন করেছেন।

তার বিশ্বাস শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে— The blindness of Tobit, খর্মবিবরক চিত্রের মধ্যে The Raising of Lazarus Christ at Emmaus (গৃহের পিটিয়ামে সজাপিত) সামাজিক উৎসবচিত্রের মধ্যে Samsons; Wedding Feast কল্পালিপি ধরনের প্রকৃতির মধ্যে An old man in Thought ও Flora উত্তোলনে চিত্র।

১৯৬৯ সালে এই মহান শিল্পী প্রাণেক্ষণ্যে করেন।

কথা : অম্বুজ সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য দেখ।

গাঠ : ৩

মাতিস

(১৮৬৯-১৯৫৪)

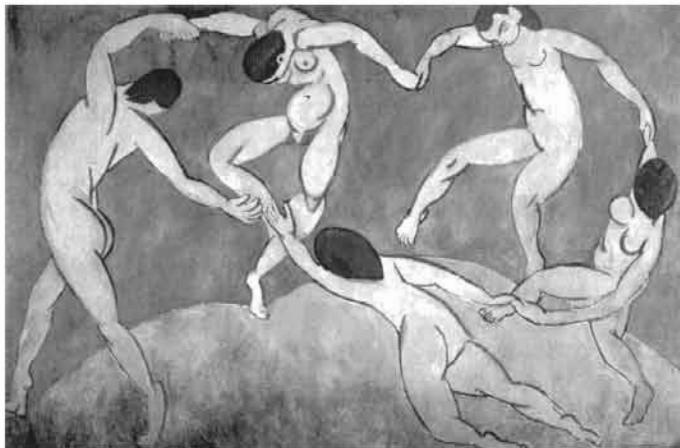


শিল্পী হেমন্ত মাতিস

১৮৬৯ সালে উত্তর মুগ্ধল মাতিস জন্মাইশ করেন। প্রথম জীবনে মাতিস আধুনিক ও প্রাচীন বৃক্ষ শিল্পীরীতি অনুশীলন করেছেন। ছবির বা চেতনা প্রকৃতি হিস তাঁর অনুভূত সক্ষতা। একেক শীতিয় মধ্যেই তিনি নিজস্ব স্বাধীন সতর প্রতির সম্মত করেছেন। প্রাচীন শুধুচিত্রের অনুশীলন বিজ্ঞাপন শিল্পচিত্রের স্বাক্ষর চিজুরাতিকে অভিন করতে পিলে সুবাদে পাইলেন এই প্রথমতি তাঁর উপরোক্তি নয়, কারণ তাঁর সুস্মক অর্থাবিদ্যাস ক্ষমতা পাইত্য অঙ্গুতি অন্তর্ভুর হয়েছিল। বাস্য হয়ে তিনি এমন একটি প্রথমতি ধৃষ্ট করেন যাকে চিজা, সির্তা, নিমৃত ফাকচসম্যালপিশ ও শিল্পচিত্রের ন্যায় সম্মতাপূর্ণ হিসেবে আল, মান, সর তিক সা ধোকলেও সর্বকে আকৃষ্ট করে। কারণ মূল কর্তৃত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকভাবে সজাতি রক্ষা করে অনন্তরামুক্ত অর্থের ক্ষিয়াসে মাতিস জন্মগত কৃতিত্ব গুরুত্ব করেছেন। আলোচ্যাম প্রয়োগ সহজ করার চিজগুলো বিদ্যার আকৃতি বাস্তব করেছে।

বিদ্য নির্বাচনে তিনি হিসেব সাক্ষী। একটা সামান্য বিষয়কেও শিল্পী তাঁর সক্ষতার তাকে প্রের্ণা দান করতে পারেন। শিল্পীর অভিনবকৌশল চিত্রের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। এটা তাঁর নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। বিদ্যের বাহ্যিকতাগ শিল্পীর নিকট সত্য হতে পারে না। শিল্পীর অন্তরে প্রতিকলিত প্রকৃতি বা বিদ্যের দৃশ্যই চিত্রের অকৃত রূপ।

মাতিসের চিত্রে পরিশ্রেষ্ঠিত উপগোক্ষিত হয়েছে— প্রতিকৃতিচিত্রে শঙ্খ, নীল প্রভৃতি বর্ণ তিনি নিজ খেয়াল খুশিতে প্রয়োগ করেছেন। বর্ণ ভাসী ও উজ্জ্বল। The Dance নামক চিত্রখালি মাতিসের একখালি বিখ্যাত চিত্র। এটা এখন মস্কোতে আছে। চিত্রখালি বলিষ্ঠ রেখা ও Wash এ অভিক্ষিত হয়েছে। চিত্রের একদল নারী—পুরুষ ছান্দিক গতিতে চলাকারে নৃত্যরত।



শিল্পী হেনরি মাতিস এর ঔকা 'The Dance'

মানুবস্থূলো এখানে বৃপ্তক, তাদের দৈহিক রূপ প্রকাশ করা শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়, তিনি নৃত্যের অন্তর্নিহিত ছান্দিক রূপ ও গতি প্রকাশ করার জন্য চিত্রখালি অঙ্গন করেছেন। খুব স্বর্ণ বর্ণ, স্বর্ণ রেখা, স্বর্ণ কলাকৌশল ও পরিশ্রমের ঘারা বিষয়ের ভাব প্রকাশ করার যে মতবাদ, তার সার্থক রূপ মাতিসের বিখ্যাত Head of a Woman চিত্র। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজ : মাতিসের চিত্রকর্মের বৈশিষ্ট্য দেখ।

পাঠ : ৪

পল সেজান

(১৮৩৯-১৯০৬)

আধুনিক চিত্রকলার জনক পল সেজান ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে রোন নদীর তীরবর্তী এক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যাঙ্কার। আর্থিক অবস্থা ছিল সজ্জল। প্রথমে যখন তিনি প্যারিসে গোলেন, অত্যন্ত জাজুক ধাক্কার কারণে লোকের সাথে মিশতে পারতেন না। তাতে পারিপার্শ্বিক লোকেরা মনে করতেন সেজান অত্যন্ত দাঢ়িক। পিতার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি চিত্রকলা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ছবি আঁকার ভূক্তি তাঁর মিটল না। সেজানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাদামাটা এবং নানা ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ। সবসময় কঠোর পরিশ্রম করতেন। ছবি আঁকা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের জন্য কখনোই সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। প্যারিসের শিক্ষা ও অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি আবার নিজ জনস্থানে ফিরে আসেন। ব্যাঙ্কার বাবার দেয়া মাসিক ১২ পাউন্ড তাত্ত্ব দিয়ে চলতেন। তিনি ছবি



শিল্পী পল সেজান



শিল্পী পল সেজানের আকা স্টিজ সাইক

বিক্রয় করা পছন্দ করতেন না। অন্তরের গভীর উপস্থিতি থেকে প্রতৃতি ও জীবনকে রঙের মায়াজালে বন্দি করার জন্যই তিনি ছবি আঁকতেন।

কখনো কখনো বাইরের চির অভ্যন্তরে তা যখন সমাত হতো ঐগুলো ঘরের নিকটবর্তী ঘোপের মাঝে ফেলে দিয়ে থাকি হাতে বাঢ়ি ফিরে আসতেন। আর এ কারণে গোপনে তাঁর স্ত্রী তাকে অনুসরণ করতেন এবং ছবিগুলো সঞ্চাহ করে গৃহের এক কোণায় সুকিয়ে রাখতেন। বলা যায় তিনি জীবিকার জন্য ছবি আঁকেন নি, বরং ছবি আকার জন্যই তিনি বেঁচে ছিলেন।

তিনি ছবি আকার একটি ধারা তৈরি

করেছিলেন যার নাম ছিল Post Impressionism. তাঁর উত্তোলন্যমূলক ছবির মধ্যে রয়েছে— তাস খেলা। ১৯০৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজ : Post Impressionism— এর ধারা কে তৈরি করেন। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য শেখ।

পাঠ : ৫

অগুস্ত রাদ্যা

(১৮৪০-১৯১৭)

ফ্রান্সের অগুস্ত বেনে রাদ্যা ফ্রান্সের পার্শ্বাত্মক ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জেলেকেলার তিনি সুস্মাষ্যের অধিকারী ছিলেন না। মাথা ভর্তি শাল চুল, লাজুক মুখচোরা বালক রাদ্যা অন্যান্য সম্বৰণী হৈ চৈ করা ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে পারতেন না। কিন্তু একা একা ছবি আকার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল পাগলের মতো মেশা। বৈশ্বব থেকেই শিল্পকার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। বাল্যকালে পাঠ্যবই—এর ইলাস্ট্রেশন ও ছবি দেখে সে রকম আকার চেষ্টা করেও কোনো শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেন নি। ছবি আকার রং, ভূলি, ক্যানভাস এগুলোর ব্যবহার যোগাতে পারবেন না সেজন্য সিদ্ধান্ত নেন ভাস্কর হওয়ার, অন্তত মাটিটা বিনামূল্যে যোগাতে পারবেন ভেবে।

তিনি একটি প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলে বছর দুই পড়াশুনা করেন। কিন্তু ল্যাটিন ও অন্যান্য গভানুগতিক বিষয়ে পড়তে তাঁর



ভাস্কর অগুস্ত রাদ্যা

মোটেই তালো সাগল না। অবশ্যে ছবি আঁকার প্রতি ছেলের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখে বাবা তাঁকে একটি চিত্রকলার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। শিক্ষক ছিলেন হোরেস লিকক দ্য বয়বস্ট্ৰি। অভ্যন্ত দক্ষ শিক্ষক লিকক ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রচলিত নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি সর্বাঙ্গে চেষ্টা করতেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব যেন বিকশিত হয়। সে যেন নিজের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখতে শেখে এবং তারপর সেই দেখার মৃত্তিকে অবস্থন করে আঁকার কাজে ব্রুতী হয়। ভাস্কুল তৈরি শেখার মধ্যে জুবে যাবার পর রাঁদ্যা শুধু এই স্কুলের ক্লাসের মধ্যেই নিজেকে আবশ্য রাখেন নি। তিনি শুভ্যরে গিয়ে প্রাচীন মার্বেলের ভাস্কুলগুলো আবিস্কার করলেন। ইল্পেরিয়াল শ্রম্যাগারে গিয়ে খোদাই কাজগুলোর ছবি আঁকলেন। বোঢ়ার হাটে গিয়ে জীবন্ত মডেল থেকে স্কেচ করলেন। এ সময় রাঁদ্যা ম্যানফ্যাকচার দ্য গবলিতে যোগ দেন। প্রথম



রাঁদ্যাৰ তৈরি ভাস্কুল 'দ্য থিংকাৰ'

থেকেই রাঁদ্যাকে তাঁৰ নিজেৰ সমস্যাৰ সমাধান নিজেকেই কৰাতে হয়েছে। অসম্ভব মনোবল, অধ্যবসায় ও আত্মিদ্বাস নিয়ে কাজ কৱেছেন। এ সময় সকাল থেকে সম্ম্যাৰ্পণ পৰ্যন্ত সারা শুহুৰ সুৱে ঘুৱে বিভিন্ন মূর্তি ও মানুষেৰ ছফ্ট কৰাতেন।

রাঁদ্যাৰ বৌবল কেটেছে কাজ নিয়ে উন্নততাৱ এবং লোক সমাজেৰ অজ্ঞাতে। এ সময় কবি বোদলেয়াৰ ও দান্তেৰ কবিতা ছিল তাঁৰ নিত্যসঙ্গী। রাঁদ্যা আজীবনই ছিলেন কাজ পাশল মানুৰ। তাঁৰ ভাস্কুলে গতি ও প্রাণময়তা ভাস্কুলকে নিয়ে এসেছিল জীবনেৰ কাছাকাছি। তাঁকে অনেকে সে সময়কাৰ ইল্পেশনিস্টদেৱ সাথে তুলনা কৰলোও তিনি ছিলেন কিছুটা সিদ্ধান্তিস্থ বা প্রতীকি ধাৰার শিল্পী। বন্ধুত্ব ও গতিময়তা তাঁৰ কাজেৰ বৈশিষ্ট্য হলো ভাস্কুলেৰ অন্য সব নিয়ম-ব্যবস্থাকেও ব্যবহাৰ কৱেছেন অভ্যন্ত দক্ষতাৰে। ভাস্কুলগুলো ছিল প্রাণময় ও আবেগপূৰ্ণ। তাঁৰ নিজেৰ উক্তিতে বলেছেন –

‘শিলেৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য সত্ত্বেও উন্নোচনে যদি কেউ তাৰ দেখাৰ জিনিসকে নিৰ্বোধেৰ মতো শুধুই দৃষ্টিলদন কৰাতে চায়, কিংবা বাস্তবেৰ দেখা কৰ্যতাকে আড়াল কৰাতে চায়, কিংবা তাৰ অন্তৰ্গত বিবাদকে শুকিয়ে রাখাতে চায়, তাহলে তাই হবে প্ৰকৃত কৰ্যতা, আৱ সেখানে কোনো ঝাঁটি অভিব্যক্তিও ধাককৰে না। তিনি আৱও বলেছেন – শ্ৰেষ্ঠ শিল মানুৰ এবং জগত সম্বলে যা কিছু জানবাৰ সবই জানিয়ে দেয়। কিছু তাৰপৱণও যা জানায় তা হলো সেখান এমন কিছু আছে যা চিৱকল অজানাই থেকে যাবে। প্ৰত্যেক মহৎ শিলকৰ্মেৰ মধ্যেই ধাকে রহস্যেৰ এই গুণাবলি।’

রাঁদ্যা সৰ্বদা তাঁৰ উপকৰণকে খোলা মনে গ্ৰহণ কৱেছেন, কখনো তাঁকে শুকোতে বা তাৰ কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাননি। তাঁৰ ফিগুৱাসুলো দেখলে মনে হয় সেগুলো যেন তাদেৱ আদি পাথৱ কিংবা মাটিৰ অবস্থা থেকে সৱাসৱি উঠে এসেছে। মাইকেল এঞ্জেলো তাঁৰ কোনো কোনো ফিগুৱ কিছুটা অসম্পূৰ্ণ রেখেছেন পৱিত্ৰে ও পৱিত্ৰিতিৰ প্ৰতিকূলতাৰ কাৱণে, বহুগত সীমাবদ্ধতাৰ জন্য। কিছু রাঁদ্যাৰ কোনো কোনো ফিগুৱ যাকে অসম্পূৰ্ণতাৰ চিহ্ন বলে মনে হয় তা শিলীৰ সচেতন সূচি, তাৰ মধ্যে ফুটে উঠেছে শিলীৰ নিজস্ব ডিজাইনেৰ বিশেৰ অভিব্যক্তি। রাঁদ্যা কখনোই নিছক বৰ্ণনায় তুল্ট হন নি। সৰ্বদা তিনি আৱো এক পা এগিয়ে গৈছেন। তাঁৰ কাজ বহুমাত্ৰিক। আমৱা সেখানে পাই বাস্তবতা, ৱোমাস্তিকতা, অভিব্যক্তিবাদ, ইল্পেশনিজম এবং যৌনতাৱ অনুজ্ঞামাখা মৱমীবাদ।

তাঁর উত্তোলনযোগ্য ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে দ্য থিংকার, চুম্বন, বালজাক, দ্য সাইরেন, দ্য সিন্ড্রেট, অনন্ত বসন্ত, ইভ, তিন ছায়ামূর্তি প্রভৃতি।

রাম্যা আজীবন চিঞ্চা করে গেছেন ভাস্কর্য নিয়ে এবং বিশ্বাস করেছেন চিঞ্চাই মানুষের অন্যতম সংস্কার। অগুস্ত রাম্যা পরোলেকগুলি করেন ১৭ই নভেম্বর। তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ হয় ম্যার্টিনে ২৪শে নভেম্বর। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দ্য থিংকার ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে তাঁর সমাধি শিয়ালে।

পাঠ : ৬

রামকিঙ্কর বেইজ

(২৬শে মে ১৯০৬-২ৱা আগস্ট ১৯৮০)

১৯০৬ সালে ২৬শে মে বাবা চঙ্গীচৰণ ও মা সম্মুণ্ণা দেবীর কোলে পঞ্চমবংশের বাঁকুড়া জেলায় যোগাপাড়ার এক আদিবাসী গ্রহে জন্মাইল করেন। বড় অভিযৌ পরিবার, ক্ষৌরকর্মই জীবিকা, শৈশবে কুমোরদের ছবি আঁকা দেখে আগনমনে ছবি আঁকতেন শুদ্ধের মতো রং-তুলি দিয়ে। মাঘার বাঢ়ি বিস্তৃপুরের কাদাকুলি যাওয়ার পথে সুত্রাধরদের বসবাস। সে সময়ই অনন্ত সুত্রাধর নামের এক মিস্ত্রির কাছে রামকিঙ্করের মূর্তি গড়ার প্রথম পাঠ। এছাড়া বিস্তৃপুরের মণ্ডিরের কাজও তাঁকে টেনেছে। মণ্ডিরের পোড়ামাটি আর পাথরের কাজের নকশ করেই শিল্পীর পথ চলা শুরু। বাঁকুড়ার বিখ্যাত শিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে এই তরুণের ভবিষ্যৎ সম্ভবনাপূর্ণ, কলাকর্ম আকৃষ্ট হওয়ার মতো। তিনি রামকিঙ্করকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে শাস্তি নিকেতনের কলাভবনে নমনাল কসুর কাছে অর্পণ করেন। লেখাপড়া যতটুকু করেছেন তাতে সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেই ছিল তাঁর আসল মনোযোগ। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বড় হবেন এই ছিল তাঁর আদর্শ ও চিঞ্চা, সে কারণেই রামকিঙ্কর ছিলেন ভারতীয় সৌভাগ্য ভাস্কর। তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যকলার অন্যতম অগ্রণীক। যিনি আধুনিক পাচাত্য শিল্প অধ্যয়ন করে সেই শৈলী নিজের ভাস্কর্যে প্রয়োগ করেন। তাঁকে ভারতীয় শিল্পে আধুনিকতার জনক ও অন্যতম প্রেরিতশিল্পী মনে করা হয়। রামকিঙ্করের কাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা। তাঁর ছবি এবং ভাস্কর্যের প্রাপ্ত সকল আকৃতিই গতিশীল। কেউই থেমে নেই। তাঁর বড় ভাস্কর্যের বেশিরভাগই উন্নত জ্ঞানগাম করা।

রামকিঙ্করের পেশাগত জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় ১৯৩৪ সালে। তিনি যখন কলাভবনের স্থায়ী শিল্পক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে অনেকগুলো কাজ তিনি শেষ করেন। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে রিলিফ, সৌভাগ্য দশ্মতি, কৃকগোপিণী, সুজাতা প্রভৃতি। ১৯৩৭ থেকে তিনি ছাত্রদের মডেলিং শেখানোর দায়িত্ব নেন। এই বছরের মার্চামারি সময়টাকে রামকিঙ্করের ভেলুং গর্বের শুরু ধরা হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তেলরং চিত্রের কাজ শেষ করেন। মহাত্মা গান্ধী, বৃক্ষ ও সুজাতা, হাটে সৌভাগ্য দশ্মতি,



শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

কাজের শেষে সৌভাগ্য রমনী, শিলং সিরিজ, শরৎকাল, ঘূসের জন্ম, নতুন শস্য, বিনোদনী, মহিলা ও কুকুর, শৈশবকাল তাঁর উত্তোলিত্যে চিত্র। একই সময়ের মধ্যে শেষ হয় তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত ভাস্কুলার কাজও, তাঁর সূর্ণিকর্মের কাল বিচারে এটিই সবচেয়ে পুরুষপূর্ণ সময় বলা যেতে পারে। এই পর্বে করা তাঁর বিখ্যাত ভাস্কুলগুলোর মধ্যে কথিকটে তৈরি সৌভাগ্য পরিবার, প্রাস্টারে করা রাবণমুনাথের প্রতিকৃতি, সিলেট দিয়ে হেড অব এ ওম্যান, বাতিদান অন্যতম।

ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় যে ‘সুজাতা’ মূর্তিটি স্থাপিত আছে এটিকে শিল্পী তাঁর একটি প্রিয় কাজ বলতেন। তিনি বলতেন – তট নড়ে, কথা বলে। প্রতিদিন যাদের নানাভাবে ও নানা কাজে দেখেছেন রামকিঙ্গর তাদের কথাই জীবন তর ভেবেছেন, তাদের তিনি ভালোবেসে তাঁর সূর্ণির মধ্যে এনে সকলের সম্মুখ চিত্রে ও ভাস্কুলের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

অভিনয় ও সংগীতের প্রতিও তাঁর প্রচল আকর্ষণ ছিল। শান্তিনিকেতনে অনেক মাটক রামকিঙ্গরের নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছে। রামকিঙ্গর চিরকুমার ছিলেন। ঘর বাঁধা হয়নি এই আত্মতোলা শিল্পীর। অনলসভাবে তিনি প্রায় ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কলাচৰীর উপাসনা করে ১৯৮০ সালের ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন।

পাঠ: ৭

বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের পরিচিতি



শিল্পী রামকিঙ্গর বেইজের তৈরি “সুজাতা”

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার যাত্রা শুরু ১৯৪৮ সালে। তখন দেশের নাম পাকিস্তান। আয়াদের এই অঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ। ভারত ভাগ হয়ে দুই দেশ হওয়ার ফলে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে অনেক মুসলমান নাগরিক চলে আসেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তারা নতুন স্বাধীন দেশে নতুন করে গড়ে তোলেন নতুন প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও নতুন জনগ�। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। এঁরা হলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন (গৱেষণাচার্য উপাধি পেয়েছেন), কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমিন, আজা শফিক আহমদ প্রমুখ। এঁরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে ও অনেক চেষ্টা করে শিল্পকলা শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম হিসেবে গভর্নমেন্ট ইনসিটিউট অব আর্ট। যাত্র বাঁচো জন ছাত্র নিয়ে প্রথম ছবি আঁকার ক্লাস শুরু হয়। পাঁচ বছরের শিক্ষা কোর্স। প্রথম সল্টি পাস করে বের হন ১৯৫০ সালে। তারপর প্রতি বছর কয়েকজন করে শিল্পকলার শিক্ষা লাভ করে পাস করতে থাকেন। এই নবীন শিল্পীদের অনেকেই তখন দেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে চলে যান, শিল্পকলায় উন্নততর শিক্ষাইশ্বর করতে। কয়েক বছর পর এরা দেশে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা, নতুন ধ্যান ধারণায় আঁকা ছবি ও ভাস্কুল প্রদর্শনী করে দেশের শিল্পকলার প্রসার ঘটাতে থাকেন। অনেকেই

যোগ দেন এই আর্ট ইনসিটিউটে। পুরোনো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকরা নবীন শিক্ষকদের পেয়ে শিল্পকলা শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে থাকেন। ধীরে ধীরে শিল্পীরা জনসাধারণকে চিত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলার প্রয়োজন বৃদ্ধাতে সমর্থ হন। বৃচ্ছি পার্টাতে থাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের। শিল্পীরা জীবনযাপনের অনেক কাজকে সুস্পর্শ বৃপ্ত ও সুবিধা দিয়ে গড়ে তুলতে থাকেন। কলে ধীরে ধীরে শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির পদ হয়, কাজের পরিপথ বাড়তে থাকে। আজ সমাজে একজন ডাক্তান, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন বিজ্ঞানী যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, একজন শিল্পীর প্রয়োজনও তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রশিল্পীরা সমাজজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ব্যবসা ও প্রশাসন-সর্বক্ষেত্রেই আজ শিল্পীদের প্রয়োজন। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, সিনেমা তৈরিতে, খবরের কাগজে ছবি, কার্টুন ও



চান্দকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুন্দর প্রকাশনায়, বই পুস্তকের জন্য ছবি, প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, বিজ্ঞাপনে, শিল্পকারখানার দ্রব্যাদির আকার-আকৃতির নকশায়, শিল্পদ্রব্যের প্যাকেটের নকশায়, পোশাকশিল্পের নকশায়, কাগড় তৈরির শিল্পে, আসবাবপত্রের নকশায় এমনি অনেক প্রয়োজনীয় কাজে শিল্পীরা তাঁদের সৌন্দর্যবোধকে কাজে লাগাচ্ছেন।

১৯৪৮ সালে যাত্রা শুরু করে সেদিনের গভর্নমেন্ট আর্ট ইনসিটিউট আজ এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদান করছে। ১৯৭১ পর্যন্ত একটিমাত্র শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করায় শিল্পীদের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি চারুকলা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ এবং সরকারি আর্ট কলেজ একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনসিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে চারুকলা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে একটি চারুকলা অনুষদ। ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে রয়েছে চারুকলা বিভাগ। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চারুকলা বিভাগ। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলাটোরনেটিভ (ইউড) সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও দেওয়া হচ্ছে চারুকলা শিক্ষা। তদুপরি ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি আর্ট কলেজ। এছাড়াও শিশুদের ছবি আঁকার জন্য শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বাংলাদেশে এখন অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রয়েছেন। দেশে-বিদেশে শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হচ্ছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে গিয়ে বাংলাদেশের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য সুনাম ও দেশের জন্য গৌরব অর্জন করছেন। তাঁদের মূল্যবান শিল্পকর্ম বিখ্যাত জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রতি দুই বছর পর আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ও সম্মেলন। প্রদর্শনীর নাম—এশিয়ান বিয়েনাল বা এশিয়ান দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী। অনেক দেশের শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এই সফল এশিয়ান বিয়েনাল এর জন্য বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আছেন। তাঁদের সবার কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীর কথা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো। অন্যান্যদের কথা ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

পাঠ : ৮

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

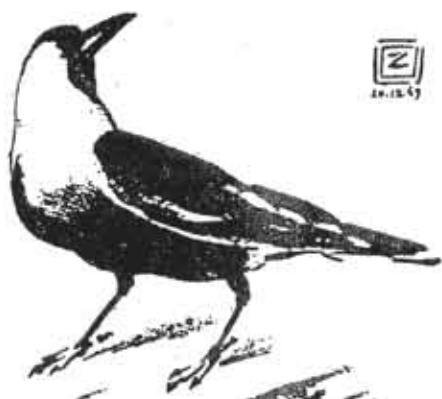
অনেক সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য ছবি একেছেন জয়নুল আবেদিন। এগুলো এখন বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশে বিখ্যাত শিল্পকর্ম। এদেশে শিল্পকলা চর্চার জন্য প্রথম যে প্রতিষ্ঠান আর্ট ইনসিটিউট-তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি বাংলাদেশের নামকরা অনেক শিল্পীকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। শিল্পীদের জন্য কর্মসূক্ষে তৈরি করেছেন। সমাজকে সুন্দরভাবে চালিত করতে শিল্পীদের প্রয়োজন তা এদেশের মানুষকে বুঝাতে পেরেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকার স্কুল ও প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে শিল্পাচার্য।

শিলাচার্ব অয়নুল আবেদিনের জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে
মুমুক্ষুল প্রাণীগতি পের করে তাঁর হস কলমাতা
আর্ট স্কুল। তালো ছাত্র হিসেবে অবসিলেই সুনাম অর্জন
করেন। আর্ট স্কুলের পিছা থেকে সেখানেই পিছকতার নিরোগ
গান। ১৯৩৮ সালে খুব তালো কল করে তিনি উর্ধ্বীর্ণ হন।

ভূগ করেনই ছবি আকার এবং ধ্যাতি অর্জন করেন অয়নুল। ১৯৫০
সালে বালায় প্রচেষ্ট সৃষ্টিক দেখা দেয়। তৎকালীন ত্রিপিশ শাসকদের
অবহেলা ও অবাসবিকার করেছেই সাধারণ বাসুজো খাবাজের
অভাব হয়েছিল। কলমাতার ইস্তায় হাতের হাতের মানুষের মৃত্যু ও
অসহায় অবস্থা ক্ষুণ্ণ পিলী অয়নুলের মনকে শীঘ্র দিয়েছিল। ত্রিপিশ
শাসকদের অঙ্গ তার দুপা জলাল—মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেন।
মানুষের মৃত্যু ও সূর্যসহ অবস্থাকে বিদ্য করে আকলেন মেটা
কালো দেখাই অনেক ছবি। যা পরবর্তীকালে সৃষ্টিকের চিত্র নামে



শিলাচার্ব অয়নুল আবেদিন



১১.১২.৭

অয়নুলের চীক 'কাক'

মুসল্লুল কালোর ঝোল আকার হয়ে ১৯৭৬
সালের ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ বাসে
লোকশিজের আসুন্ন গড়ে তোলার কাজ করে
যাইছেন। বাণাই শুরোনো রাজধানী
সোনাগলীয়ে এই লোকশিজের আসুন্ন। শুরু
করেছিলেন কিন্তু পের করতে পারেননি।

শিলাচার্বের প্রের্ণ শিলকর্মসূলোর সাথ- সৃষ্টিকের
চিত্র-১৯৪৩, সহায়, হই দেয়া, পুরু গাঢ়ি,
পুষ্টামা, সৌভাগ্য, সুমকার ছবি, ধসাধস,

পরিচিত হলো। রাতেরাতি পিলীর নাম হড়িয়ে গড়ল সারা
তারাকে।

তারাকের বাইজ্ঞান অনেক উন্নত দেশে পিলী অয়নুলের
সৃষ্টিকের চিত্র বিদ্যে নামকরা দেকেনো প্রা-প্রিকার তাঁর
প্রশংসন করে দিয়েছেন। শিলাচার্ব অয়নুল আবেদিন বৈতাইলেন
৭২ বর্ষ।

সকলের কর্ম-সচল হিসেব তিনি। হাঁটাঁ করেই সুয়ারোপ্য



অয়নুলের চীক গুু

পাইন্যার যা, নবাব (৬০ কুট শীর্ষ স্কল) মনগুলো—
৭০ (২০ কুট শীর্ষ স্কল)। আর্দ্ধনভা রূপকে বিবর
করে একেহেম “মুক্তিবোম্বা” নামের হয়। কৌতুর
সংগ্রহ রয়েছে জাতীয় আনন্দমন্ডল, মুমুক্ষুসিংহে অবস্থু
সঞ্চালনালার এবং সেলে—বিদেশে ব্যক্তিগত ও
প্রাক্তিকানিক সঞ্চালনালার। শিল্পাচার্য তাঁর সাম্রা
জীবনে অনেক প্রস্তর, সমান ও প্রস্তা অর্জন
করেছেন। বিশ্বের বহু সেলে তিনি আবহাও
যোগেন। শিল্পী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কি পিট উপাধি
দেন। বাহাদুর সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের
সম্মান পাও করেন।



শিল্পাচার্য অবস্থু আবেদিনের চীবা ‘মুর্তিক’—১৯৪৩



অবস্থু আবেদিনের চীবা মুর্তিক ১৯৪৩—এর একটি হ্যান্ডেল

শিল্পী কর্তৃতেন কিনা জানা যায়নি। ছুইঁ—এ তাঁর দক্ষতা সূচনাহীন। আর্ট
ইনসিটিউটের তিনিও একজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠা
নিয়ে অনেক শিল্পীদের গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে শীর্ষস্থান ধূরে গড়ে
কোলেন নকশা কেছে। নকশা কেলেন্দ্র পরিচালক হিলেন। একসম্পর্কে
অস্থ্য মনুস সত্য সকলা তৈরি করেন ঝোলুকের জন্য ও অন্যান্য
কাল্পনিকের জন্য।

জন ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ কলকাতায়। কলকাতা আর্ট স্কুলে চিত্রকলায়
শিক্ষা পাও করেন। তরুণ কলেজেই ব্রহ্মচরী আলোচনে যোগিতা পানেন।
১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই আলোচনে সক্রিয়তাৰে মুক্ত হিলেন। ক্রৃতচরী
আলোচনা হলো বীটি বাজালি হিলেবে নিজেকে তৈরি কৰা এবং অন্যকেও

পাও : ১

কামলুল হাজারা

জীবনের পঞ্চাশ বছর সময়কাল তিনি
অস্থ্য হবি একেহেম। প্রতিসিন্ধি তিনি
হবি জীৱকৰেন। আৱ একটি—মুটি সহ,
অনেক। একটা হিলাব ধৰা যাব—
প্রতিসিন্ধি এটি কোৱ ছইঁ কৰলে ৫০ বছরে
দোকান আৰ ১ লক্ষ ছইঁ। হো, তাঁৰ যতো
এত বেশি ছইঁ সামা বিশ্বের আৰ কোলো



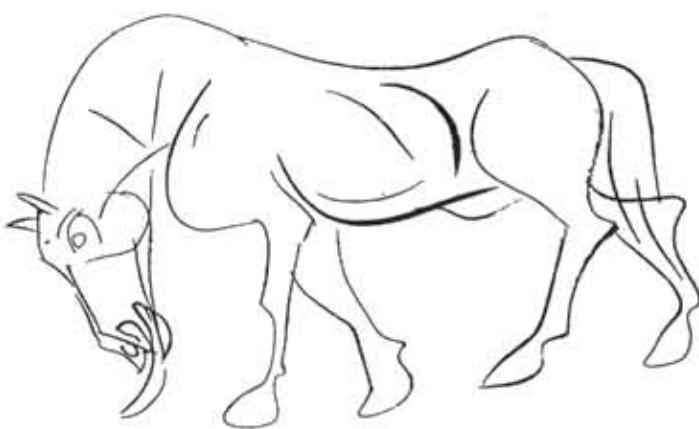
কামলুল হাজারের চীবা শিল্পের মূখ

উত্তোলন করা। অনামিকে শিল্প-বিশেষজ্ঞের বীটি বাণিজ ও উপকূল নামান্বিক হিসেবে গঠিত কোলার জন্য 'মুকুল কোল' গঠিত কোলেন। তিনি ছিলেন মুকুল কোলের সর্বাধিনায়ক (১৯৪৬-৫১)। শরীর চৰীচৰণ কার সুনায ছিল। সুন্দর সেহ ও সু-স্বাচ্ছেয় জন্য-১৯৪৫ সালে যিঃ বেলাল উপাধি ও পুরস্কার প্রদত্ত কর্তৃত।



কামল হাসানের আৰক্ষ : জোল ও পাখি

কামল হাসানের স্বচ্ছের উত্তোলনে কাছ স্বাধীনতা মুক্ষের সবৰ আৰক্ষ ছবি-ইয়াহিয়ার আনোয়াওয়ের মতো মুখ। এটি একটি পোস্টারচিত্ৰ। যার মধ্যে দেখা হিল এই আনোয়াওয়ের হত্যা কৰাতে হৈবে। ইয়াহিয়ার মুখ আনোয়াও আকৃতি। যে লক লক বাণিজিৰ হত্যার হোতা। তাই এই পোস্টারচিত্ৰ আৰক্ষ গুণে মুক্ষিযুদ্ধের জন্য হিল উৎসাহ ও প্ৰেৰণাৰ এক অস্তৰ। তাই একটি ছবিই কাছ কৱাহে অন্তৰ-লক যৌবিনগানেৰ।



কামল হাসানের একটি ছবি : বোঢ়া

ঞঁই জানোয়ারদেৱ



হত্যা কৰতে হৰে

কামল হাসানের বিশ্বাত পোস্টারচিত্ৰ
মুক্ষিযুদ্ধ-৭১ এৰ অন্য আৰক্ষ

কামরূপ হাসান টোর হৃষি আৰা, দেখা, বজ্রুতা অৰ্থাৎ সব গ্ৰন্থৰ কাজেৰ মধ্য গিজে অন্যান ও অতিকাঙ্গেৱ কিমুল্পে অতিবাদ কৰাবে৳। কথিদেৱ ধৰণি এক প্ৰতিশালী কথিকাৰ সভাৰ সভাপতিবৰ কৰাৰ সময় ১৯৮৮ সালেৱ ২৩ো বেজুলারি হৃদয়জোৱাৰ কিমো বৰ্ষ হৱে অন্তামেৱ ঘণ্টেই মৃত্যুব্যৰ্থ কৰেন। কামরূপ হাসান বালাদেশেৱ জাতীয় পত্ৰিকাৰ মৃগৰূৰ ধৰ্যং বালাদেশেৱ জাতীয় প্ৰতীকেৰ নকশা নিৰ্মাণ কৰেন। সোৱা জীৱনে তিনি অনেক উত্তোলন কৰেছেন। সামাজিক ও জাতীয়তাবে অনেক সম্ভাবনা, প্ৰস্থা ও প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজনে।

টোক একুলে গানকে সুন্ধিত কৰা হৈ। টোক বিখ্যাত ছবিলোহো সুবালু, উকি দেয়া, তিসৰকস্যা, বালাদেশ চূল, হেলে, পৌচা, নাইজেৱ, পিয়াল, বালাদেশ, প্ৰেছত্বাৰ আপে ও গৱে ইত্যাদি। টোক অনেক হৃষি সংৰাহ কৰেছে বালাদেশ জাতীয় জামুয়াৱে।

পাঠ : ১০

আনোয়াজুল হক

শিল্পকাৰ একজন নিয়েদিত প্ৰাণ ও শিক্ষক হিসেবে শিলী আনোয়াজুল হক খ্যাতি অৰ্জন কৰেন। প্ৰতিটি হাতাকে তিনি হাতে থকে শেখাবেন। টোক সোৱা জীৱন কাটো চাহুকলা ইনসিটিউটেট শিক্ষকতা কৰে। তিনি কঞ্জেকৰাৰ চাহুকলা ইনসিটিউটেটে অধ্যয়কৰণ মাস্তিষ্ঠ পালন কৰেন। হাঁকে হাঁকে কিছি চিত্ৰকলা কৰে বেৰে পেছেন। অলংকৃত সূচন হৃষি আৰাকাৰ টোক খ্যাতি হিল।

তিনি অনুবাদ কৰেন আৰ্টিকলৰ উপাধাৰ। হেলেকো সেখানেই কাটে। শিল্পকাৰ শিক্ষাব্যৱহাৰ কৰেন কলকাতা আৰ্ট স্কুলে। তামাগুৰ সেখানেই অৰূপ বয়সে শিক্ষকতাৰ বোগ দেন। কাৰপৰ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আৰ্ট ইনসিটিউটেটে বোগ গিজে মৃত্যু পৰিষ্কাৰ উকি অতিকাঙ্গেই শিক্ষকতা কৰে গিয়েছেন। তিনি ১৯৮২ সালে মৃত্যুব্যৰ্থ কৰেন।



শিলী আনোয়াজুল হক

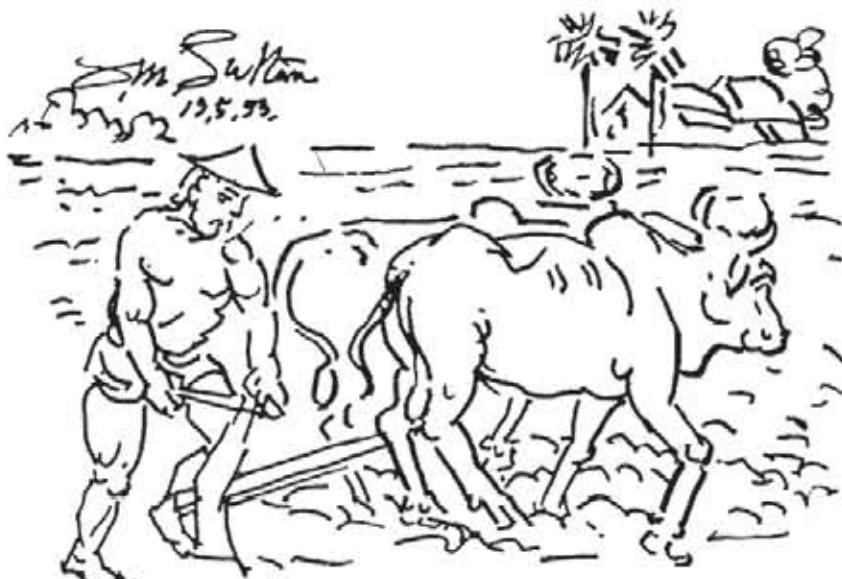
পাঠ : ১১

এস. এম. সুলতান

একজন ধেঞ্জলী মানুৰ ও বৈশিষ্ট্যময় চিত্ৰকলাৰ শিলী হিসেবে খ্যাতি অৰ্জন কৰাবে৳। টোক হবিব বিবৰ বালাদেশেৱ শাম জীৱন, চাম-বাল, কৃষক, জেলে ও বেটে খাড়া মানুৰ। টোক হবিব মানুকেৱা বাস্তবেৱ মতো নয়। বলিষ্ঠ মেহ ও শক্তিশালি। টোক আৰাকাৰ পুণ্য হৃষি দুৰাতে কাৰাও ককে হয় না। তিনি টোক হবিব মানুৰকে ব্যাখ্যা কৰেন ধৰ্মাবে, যে কৃষকস্তুলকে আমৱা সেৰি-কালেৱ বাইজেৱ চূল, তাৰ স্বাস্থ্য সূৰ্যৰ শৰীৰ। আসলে কো জা সৱ। কৃষকস্তুল অমি কৰ্মৰ্প কৰে, ফসল কলাব, ধোন্দ জোৱাৰ। কাৰাই কো আসলে সেশেৱ শক্তি। কাদেৱ লেকজেৱ ঝুঁটা শক্তিশালী। সুলতান



সুলতান নিজেই একেছেন নিজেৰ প্ৰতিকৃতি



শিল্প এস. এম. সুলতানের আঁকা ছবিচার

অসমীয়া কঙ্গন সভাইলৈ ১৯২৩ সালে। তাঁর হেসেবেলো কঠটে থামে। কানপুর ছবি আৰু প্ৰেছেন কলকাতা আৰ্ট স্কুলে। তৎপৰ কোৱা হয়ে পড়েন— মুভু কেড়োন দেশ-বিদেশে। ছবি আৰু কেড়োন, আৰু যাবো প্ৰদৰ্শনী কঙ্গন আৰু উদ্দেশ্যহীন তথ্যুক্ত জীবন। তাহত, পাকিস্তানেৰ অনেক অংশে মুৱেহেন।

মুৱেহেন ইউজোল ও আমেৰিকাৰ অনেক দেশ। বেণু-ভূষণ ছিল অৱৰ সবাৰ পেকে আলাদা। অস্বা ভূল, কৰলো গা পৰ্যবেক্ষণীয় আলোচনা পৰা, কৰলো সেৱনীয় চাপৰ সামা গাবে অক্ষিয়ে, কৰলো মেৰেসেৱ বজোই শাঢ়ি ও চুড়ি পৰে দূৱাবেন। সন্ধুলীৰ মজোই জীবন ফাটিবেহেন। শেষ বৰষে সভাইলৈ বিজেৱ অসমীয়ানো বসবাস কঙ্গন। শিশুদেৱ অস্য বিশ্বে খননেৱ শিকায় স্কুল কঙ্গন। সাম শিশুস্বৰ্গ। শিশুৱা লেখাপঞ্চা কৰবে। ছবি আৰু বে, গাম গাইবে, শকৃতি, গাহপালা, জীৰ-জুৰু সাথে আপন হৰে বিশ্বে যাবে। মনেৱ আনন্দে সব শিখবে। জোৱ কৰে সহ। সুলতান অনেক পণ্ড-পাখি পালতেন। নিজেৱ সভানেৱ মজো দে সব পণ্ড-পাখিকে বন্ধ কৰাবেন। ১৯১৯ সালে সভাইলৈ একাত্তৰ বছৰ বৰষে মৃত্যুন্মুক্ত কৰেন। তাঁৰ চিকিৎসাৰ্থ বালাসেপোৰ অমৃত্যু সম্মুখ। শিক্ষকলায় কেৱল তাঁৰ অক্ষণানোৱ অস্য বালাসেপ সুৰক্ষাৰ কাকে 'অসিঙ্গেট আর্টিস্টেৱ' সম্বাদ প্ৰদান কৰেন। তিনি আৰীমতা পদব লাভ কৰেন।

পাঠ : ১২

শকিংটনিন আহমেদ

শিক্ষকলায় একজন আদৰ্শ শিক্ষক। পৱিত্ৰ বৃচ্ছি, মাৰ্জিত স্বত্ত্বাৰ এবং সকল চিকাপিলী হিসেবে সুনাম আৰ্দ্ধ কৰাবেন। ছাপচিয়ে, বিশ্বে কৰে কঠ খোদাই, ঘটিং, ধাৰেৰাটিং, ঝাই-গৱেষণ ও তিল ঘটিং মাধ্যমে একজন খ্যাতিমান চিকাপিলী। আৰ্ট ইম্পিটিটিউটেৱ প্রতিষ্ঠা হোকেই শিক্ষকতা কৰাবেন। বালাসেপোৰ অনেক খ্যাতিমান চিকাপিলীকে তাঁৰ বেধা, শিল চেতনা, শিক্ষা দিবে শিল্পী হিসেবে পঢ়ে কৰাবেন। শকিংটনিসেৱ জন্ম কলকাতায় ১৯২২ সালে। ছবি আৰু প্ৰেছেন কলকাতা আৰ্ট স্কুলে। কানপুৰ বিজুলিন সেখানেই শিক্ষকতা কৰেন। ভূৰ্ণ বৰষেই তাঁৰ কঠ খোদাই ছাপচিয়েৱ জন্ম

সামা ভাঙতে খ্যাতি অর্জন করেন। ফৌজ দে সব জিবুলো
হলো সীওড়াল মেজে, শামের পথে ইত্যাদি।

শিশী পফিটেছিন আহমেদ ফেন্সারেও আসেক হবি একেছেন।
ছাপ প্রতিক্রিয় চিঠ্ঠি দে সব বিষয়ে হবি একেছেন সেগুলো
হলো—বন্দা, জেল, জাল ও মাছ বিবরক হবি, নোকা, বড়
ইত্যাদি নিসর্গচিত্ত ও ‘চোখ’ বিষয়ে চিঠ্ঠিকা। শিরার্থ জয়নুল
আবেদিন তাঁর সম্মার্কে মনুষ্য করেছেন— শিরকলার মান বিচারে
অর্ধাং কোন ছবিটি তালো এবং কোনটির মান উঙ্গীর তা
সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন শিশী পফিটেছিন আহমেদ।
জীবনে অনেক পুরস্কার ও সম্মানসহ একুশে পদক অর্জন
করেছেন। ২০১০ মে ২০১২ তারিখে এই প্রতিভাবান শিশী
প্রাণোক্তিমন করেন।



পৰ্তি : ১৩

কালী আনুল কাশেয়

শিশী পফিটেছিন আহমেদের কাঠ খোদাই চির-সীওড়াল

একজন সকল পুতুক চিরাপের শিশী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। চিরাপ ও পক্ষাশ স্থানে হই, প্রশংসিতর থজন ও
ইলাস্ট্রেশন (হবি) তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। ‘সোপেয়ালা’ হস্তান্তরে মাজিনেটিক ও সামাজিক কার্টুন একে খ্যাতি লাভ
করেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য শিখেছেন এবং শিশু সাহিত্য অবদানের জন্য বালা একজোড়ি পুরস্কার পান। তাঁর
জন্ম ১৯১৩ সালে ফরিদপুরে। হবি আকার শিখেছেন নিজের চেকাই-কোনো আর্টস্কুলে গড়ার সুযোগ পাননি।
শিশুদের বইয়ে হবি আকার জন্য কর্তৃকর্তৃ জাতীয় প্রশংসকের থেকে পুরস্কৃত হন এবং সর্বিগ্রামক লাভ করেন।



১৯৫২ সালের তাবা আনন্দশনের বিষয়ে এই কর্মুন একেছেন ‘সোপেয়ালা’ ও শিশী কালী আনুল কাশেয়

বাংলাদেশের শিল্পকলার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা এখন অনেক। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে আলোচনা হলো। তাঁদের সমসাময়িক আরও যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন শিল্পী খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন প্রমুখ।

ঁদের পরে যে সব শিল্পীরা চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, দেবদাস চৰকৰ্তা, হামিদুর রাহমান, নতেরা আহমেদ, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত, নিতুন কুন্ড, জোনাবুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, সমরজ্জিত রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুল নবী, আবু তাহের, গোলাম সারোয়ার, মাহমুদুল হক, কালীদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান, কাজী গিয়াস, স্বপন চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলতী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার, অলক রায়, মনসুরুল করিম, কে এম এ কাইয়ুম, ফরিদা জামান, শওকাতুজ্জামান, শায়ীম আরা শিকদার, রনজিত দাস প্রমুখ।

পাঠ : ১৪

আমাদের শিল্পকলায় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুক্তির চেতনা

আমাদের শিল্পকলার ঐতিহ্য মূলত আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে এসেছে। আবহমান গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্যময় জীবন আর আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে গড়ে উঠেছে আমাদের শিল্পসংস্কৃতি। এদেশের চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন তাই তাঁর চিত্রের মাঝে তুলে ধরেছেন লোকজ ফর্মে সাধারণ মানুষের সরলতা, শুদ্ধতা। লোকশিল্পের তিনি যেসব ফর্ম আবিষ্কার করেছেন, সেসবের দেখা মেলে তাঁর আঁকা তিন মহিলা, গুনটানা, বাংলাদেশের মেয়ে, মাঝি ইত্যাদি ছবিতে। প্রকৃতির রূপ তার কাছে স্থিত, কোমল। বাইরের পৃথিবী তাঁর কাছে ধরা দেয় কোমলতা ও সুষমতার ভিত্তিতে। তাঁর সহযোগ্য শিল্পী কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক কিংবা এস. এম. সুলতানসহ অনেকেই এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। লোকজ রীতি গ্রামে, মানুষের মনে, স্মৃতিতে, পুরোনো কাহিনীতে জীবন্ত। আর তাকে নির্মাণ করে কামরুল হাসান ছবি এঁকেছেন। কামরুল হাসানের আঁকা সরা, শখের হাঁড়ি, পুতুল এবং তাঁর চিত্রকলা তিনকল্যা, নাইওর এসব ছবির মাঝে বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে লোকজ জীবনের আভাস ফুটে ওঠে। চড়া রং ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশতত্ত্বিও ছিল লোক ঐতিহ্যের সাথে সম্মুক্ত। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে পূর্বের ফর্ম ভেঙে নতুন সময়ের সপ্ন ও যত্নণা, আশা ও হতাশাকে এঁকেছেন।

বাংলা, বাঙালি এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনের ধারা খুঁজে পাওয়া যায় আর এক মহান শিল্পী এস. এম. সুলতানের ছবিতে। তাঁর ছবি বাঞ্ছবের মতো নয়। তাঁর ছবির মানুষগুলোর বাইরের রূপের চেয়ে তাঁর অনুরিহিত যে রূপ অর্থাৎ কৃষককূল, যাঁদের শ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণ করি আমরা, তাঁদেরকে তিনি এঁকেছেন শক্তিমান ও পেশিবহুল মানুষ হিসেবে।

রশিদ চৌধুরীর চিত্রকলায় আমাদের শিল্পকলার ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে একটু ভিন্নভাবে। রূপকথা, লোককথা, কুসংস্কার, পুঁথির গথ ধরে তিনি যে প্রতীক গড়ে তুলেছেন তাতে মিশে আছে কল্পনার জগৎ, উদ্ধিদ জগৎ ও পশু-পাখির জগৎ। তাঁর আঁকা হাতি, ঘোড়া, পাখি, ময়ূর, মোরগ সবই যেন লোককথা ও রূপকথায় বিস্তৃত। ট্যাপিস্ট্রিতে বহু কাজ

করেছেন তিনি। এদের ধারাবাহিকতায় শিল্পী কাইমু চৌধুরী, হাশেম খান ও অন্যান্য শিল্পীরাও চিত্রকলার ঐতিহ্যকে ভূলে ধরেছেন। অন্যদিকে লোকজ ধারায় কাজ করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুরুল নাচকে বিষয় করে পার্পেট শিল্পকে জনপ্রিয় করেছেন শিল্পী মুস্তাফা মনোজার।

বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ইতিহাসের ফসল। তিভি তার কৃষিজ, থকাশ তার বিভিন্ন। নকশিকারী, সরা, পুতুল, শীতলপাটি, হাঁড়ি, ধীপ ও বেডের কাজ হচ্ছে লোকজ শিল্প বা আমাদের ঐতিহ্যের ঝুঁগ। আর এর সাথে আছে আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস।

শিল্পকলার এই বে ঐতিহ্য এটা যেমন হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার চলে এসেছে, তেমনি বাহানুর ভাষা আল্মোলন থেকে শুরু করে একাড়ের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আমাদের এই স্বাধীন সর্বভৌম দেশ, আমাদের লাগ সরুজ পতাকা। তিরিশ শক শহিদের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই মাতৃভূমি। আপামর

জনসাধারণের সাথে আমাদের প্রতিষ্যশা চিত্রশিল্পীরাও সেদিন তাদের রং-ভূলি দিয়ে পোস্টার, ফেন্সেল, প্লাকার্ড তদানিন্তন স্বাধীনতা বিরোধী পশ্চিমাগোষ্ঠী হায়েনাদের বুগাটি ভূলে ধরে উজ্জীবিত করেছিলেন এদেশের মুক্তিকারী মানুষদের। ঘার নির্দর্শন হিসেবে আমরা দেখতে পাই কামরুল হাসানের সেই বিখ্যাত পোস্টার ইয়াহিয়ার ছবি সম্বলিত লেখা ‘এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে’। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে বেসকল তাঙ্কর্ব বিশেষ করে অপরাজেয় বাংলা, সোপার্জিত স্বাধীনতা, শাবাশ বাংলাদেশ, জাহাত চৌরঙ্গি, সংশ্লিষ্ট এবং শহিদমিনার, মুক্তিসৌধসহ বাংলাদেশের নানান জায়গায় যেসকল ভাস্কর্য ও মুক্তিষূল্প তৈরি হয়েছে, তার মাঝে প্রতিক্রিয়িত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বা বুগ বুগ ধরে এ দেশের ঐতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভূলে ধরবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্প- সাহিত্যের অঙ্গনে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সংগীতের মতো চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধ এসেছে তার বহুমাত্রিক বুগ নিয়ে। আমাদের শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে অজন্তু শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন এবং করছেন।

কাজ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেসব ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে, তাদের কয়েকটি নাম লেখ।



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত শিল্পী নিতুল কুণ্ডুর
নির্মিত ভাস্কর্য ‘শাবাশ বাংলাদেশ’

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। “দোপেয়াজা” কোন শিল্পীর ছন্দনাম ?
 ক. রফিকুল নবী খ. হাশেম খান
 গ. কাজী আবুল কাশেম ঘ. মুস্তাফা মনোয়ার
- ২। “এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে” শিরোনামে পোস্টারটি কে অঙ্কন করেন ?
 ক. কাইয়ুম চৌধুরী খ. কামরুল হাসান
 গ. প্রাণেশ মণ্ডল ঘ. নিতুন কুণ্ডু
- ৩। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা “নবান্ন” ছবির দৈর্ঘ্য কত ছিল ?
 ক. ৭০ ফুট খ. ৭৫ ফুট
 গ. ৬৫ ফুট ঘ. ৬০ ফুট
- ৪। চারকলা অনুষ্ঠন কত সালে প্রতিষ্ঠা হয় ?
 ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫৭ সালে
 গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৭০ সালে
- ৫। “মই দেয়া” ছবিটি কে অঙ্কন করেন ?
 ক. শিল্পী কামরুল হাসান খ. শিল্পী মতুর্জা বশীর
 গ. হাশেম খান ঘ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- ৬। রেমব্রান্ট কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন ?
 ক. জার্মানীতে খ. লন্ডনে
 গ. ইটালিতে ঘ. হল্যান্ডে
- ৭। “The Dance” চিত্রটি কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম ?
 ক. মাতিস খ. রেমব্রান্ট
 গ. পাবলো পিকাসো ঘ. পল সেজান
- ৮। আধুনিক চিত্রকলার জনক কে ?
 ক. পল সেজান খ. পাবলো পিকাসো
 গ. মাতিস ঘ. ভ্যান গব
- ৯। গভর্নমেন্ট ইনসিটিউট অব আর্ট -এ প্রথম বর্ষে কতজন ছাত্র ছিল?
 ক. ১২ জন খ. ১৫ জন
 গ. ১৪ জন ঘ. ১৩ জন
- ১০। “শিশুস্বর্গ” কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
 ক. এস.এম. সুলতান খ. কামরুল হাসান
 গ. শফিউদ্দিন আহমেদ ঘ. আনোয়ারুল হক

লিখে জবাব দাও

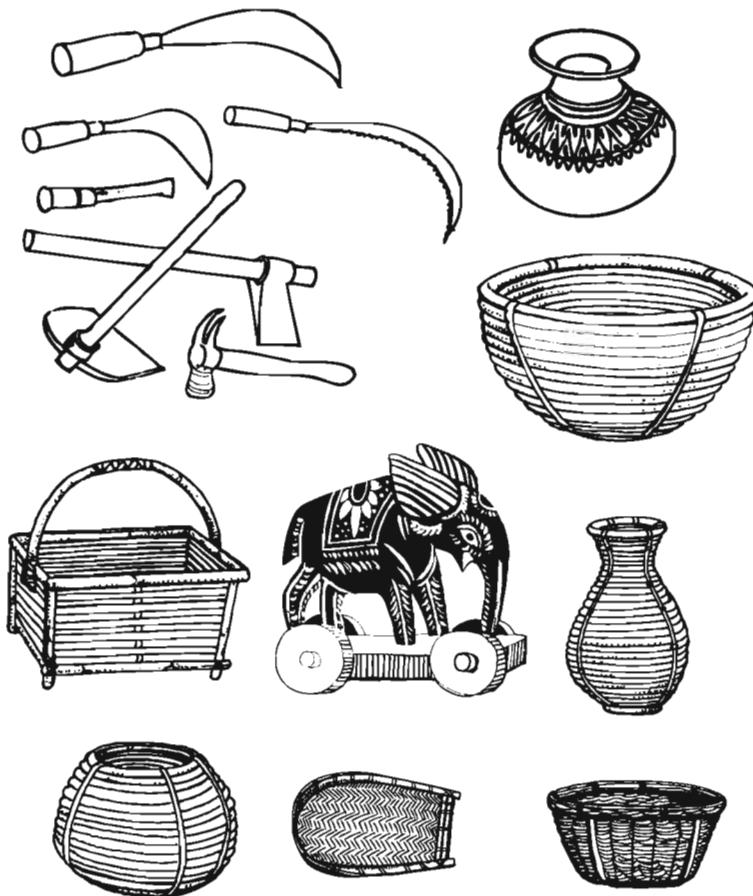
- ১। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা সম্পর্কে যা জান লেখ।
- ২। শিল্পাচার্য কাকে বলা হয়? তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে লেখ।
- ৩। ব্রতচারী আন্দোলন করেছিলেন কোন শিল্পী? তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৪। শিল্পকলার একজন নিবেদিত প্রাণ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কে তিনি? তাঁর সম্পর্কে লেখ।
- ৫। তিনি শিল্পকলার মান সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন। কোন শিল্পী সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত লেখ।
- ৬। ‘শিশু সর্গ কী? কোন শিল্পী শিশু সর্গ তৈরি করেছেন। শিল্পী সম্পর্কে যা জান লেখ।
- ৭। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ১২ জন শিল্পীর নাম লেখ। এঁদের মধ্যে যে কোনো একজন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৮। আধুনিক চিত্রকলার জনক পল সেজান সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
- ৯। শিল্পী রামকিঙ্গর বেইজের কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখ।
- ১০। রামকিঙ্গরকে প্রাচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের জনক হিসেবে মূল্যায়ন কর।
- ১১। বিশ্বে আধুনিক ভাস্কর হিসেবে রাঁঁয়ার কাজের বৈশিষ্ট্য লেখ।

সংক্ষেপে জবাব দাও

- ১। শিল্পকলা শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এমন ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীর নাম লেখ।
- ২। শিল্পকলা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম কী? কোন সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?
- ৩। সমাজ জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকলার শিল্পীদের প্রয়োজন?
- ৪। ‘এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে’ শীর্ষক ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। আধুনিক ভাস্কর্যের জনক কে? তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ৬। দোপেয়াজা কী বা কে? সংক্ষেপে লেখ।
- ৭। রেম্ব্রান্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাঙালির গ্রামীণ জীবনে চারু ও কারুকলার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন পেশায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- লোকজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে ও উদাহরণ দিতে পারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

গোকায়ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি

লোকজীবন হলো মানুষের জীবন। সেই মানুষ যখন বাঙালি— অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছি, স্থায়ীভাবেই বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে বসবাস করছি তাদের জীবনযাপনে স্বাভাবিকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হলো চারু ও কারুকলার ব্যবহার ও অন্যান্য সংস্কৃতি। তবে অঞ্চলভিত্তিক লোকজীবনে কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন— গ্রামের জীবনযাপনে এবং শহরের জীবনযাপনে বৈপরিত্য রয়েছে। আবার গ্রামের জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে পোশাক-পরিছদে বিভিন্নতা, ঘরবাড়ি তৈরিতে বিভিন্নতা, চাষবাস ইত্যাদিতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আবার মিলও আছে অনেক। আদিবাসী ও স্কুল নৃ-গোষ্ঠীর লোকজীবনেও চারু ও কারুকলার ব্যবহার অনেক। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। শহরের ঘরবাড়ি বেশিরভাগই ইট, লোহা ও কাঠের তৈরি। আজকাল যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আসবাবপত্র এবং বসবাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো একটির সঙ্গে আরেকটির সামঞ্জস্য করে তৈরি করা হয়। খাওয়া দাওয়ার টেবিল, চেয়ার, খাট, পালং, আলমারি, পোশাক-পরিছদ রাখার আলমারি, বই রাখার আলমারি, সোফাসেট, দরজা, জানালা সর্বত্রই চারু ও কারুকলার প্রতিফলন ঘটানো হয়। নানারকম নকশা করে এসব আবাসিক বস্তুসামগ্ৰীৰ শিল্পরূপ দেয়া হয়। কাঠের দরজা, জানালা ও খাট-পালং-এ কারুশিল্পীরা খোদাই করে ফুল, পাখি, লতাপাতা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্ৰ ফুটিয়ে তোলেন। আবার কিছু দরজা ও অন্যান্য আসবাবে জ্যামিতিক নকশা ও রেখার সমন্বয়ে শিল্পরূপ দেয়া হয়। দরজা-জানালায় যে সব পর্দা টাঙানো হয় তার রং, নকশার ছাপ, লতাপাতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য চারু ও কারুশিল্পীরাই ফুটিয়ে তোলেন। কখনো তাঁতি বুননের মাধ্যমে কখনো কারুশিল্পী নানারকম কাঠ ও রাবারের ব্লক তৈরি করে ছাপ তুলে তা করে থাকেন। বাড়িঘরের অন্যান্য সাজসজ্জায় সর্বত্রই চারু ও কারুশিল্পীদের কাজ ব্যবহার করা হয়। যেমন— তিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতি, বর-কনে, পেঁচা, পাখি ইত্যাদি। টেরাকোটা ফলক, পোড়ামাটির ছেট বড় টেপা পুতুল, হাতি, ঘোড়া মানুষসহ পোড়ামাটির ফুলদানি, নানা আকার ও আকৃতির পাত্র, শখের ইঁড়ি, লঙ্ঘীসৱা, পাটের শিকা, খলে ও অন্যান্য কারুশিল্প নকশিকাথা ইত্যাদি। এসব শিল্পকর্ম বেশিরভাগই বাংলার গ্রাম্যঅঞ্চলের মানুষেরা করে থাকে। কিছু তৈরি হয় চারু ও কারুকলা চৰ্চাৰ স্বাভাবিক কারণে ও স্বভাবগত অভ্যাসে। আমরা এসব শিল্পকে তাই নাম দিয়েছি লোকশিল্প। আবার জীবনযাপনের প্রয়োজনে— বাঁশ, বেত, পাট ইত্যাদি উপকরণে এবং মাটির ইঁড়ি-পাতিল যারা বানান লোহা, পিতল, কাঁসার বিভিন্ন ব্যবহারিক বস্তুসামগ্ৰী যারা তৈরি করেন (দা, কুড়াল, লাঙল, কোদাল, থালাবাটি, কলসি ইত্যাদি) তাঁদের নাম কারুশিল্পী।

বর্তমানে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের বিশেষ কিছু বস্তুসামগ্ৰী বাণিজ্যিকভাবে দেশে-বিদেশে বিস্তারের জন্য শহরে বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি হয়ে থাকে।

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত চিৰাশিল্পীদের আঁকা চিত্ৰকৰ্ম দেয়ালে টাপিয়ে এবং ভাস্কুলদের তৈরি সিমেন্ট, পাথর, ৰোঞ্জ ও কাঠের ছেট ভাস্কৰ্য সাজিয়ে চারু ও কারুশিল্পকে সুন্দর জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে।

গ্রাম : গ্রামের ঘরবাড়ির আদল শহর থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। প্রথাগত ও অর্থনৈতিক কারণে গ্রামের ঘরবাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, টিন, ছন, পাটখড়ি, খড়, গোলপাতা, নারকেলপাতা ইত্যাদি দিয়ে। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার তাঁরাই নিজেদের প্রয়োজনমতো এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বসবাস উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নিজেরা স্থাপত্যকলায় পারদশী না হলেও স্বাভাবিক চিন্তায় এসব ঘরবাড়িতে গ্রামের পেশাজীবী মানুষদের ফর্মা-৫, চারু ও কারুকলা-৯ম-১০ম

শিল্পবোধের ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দোচালা ঘর, চোচালা ও আটচালা ঘরবাড়িতে বাঁশ, বেত ও কাঠের নানারকম শিল্পকর্মের মাধ্যমে চারু ও কারুকলার প্রকাশ ঘটে।

বাড়ি, বন্যা, ইত্যকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল গ্রামেও ইটের ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। দালানকেঠা হলেও শহরের মতো না হয়ে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনে রেখে সেগুলো তৈরি হয়।

গ্রামের লোকজীবনে যেসব পেশা রয়েছে— তাদের জীবনযাপনে যেসব বস্তুসামগ্ৰী প্রয়োজন হয় তাতে কম বেশি চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োগ দেখা যায়। এসব বস্তুসামগ্ৰী শহুরে জীবনেও কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে। যা আগে উল্লেখ করেছি। যেমন দা, কুড়াল, কোদাল, কাস্তে, খস্তা, লাঙ্গল, জোয়াল, মই এগুলো কামারেরা লোহা পিটিয়ে তৈরি করে। জোয়াল ও মই অবশ্য কাঠ ও বাঁশের তৈরি। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় ছেট বড় নানা আকৃতির টুকরি, কুলা, বাঁকা, খালুই, মাছ ধরার চাই। মাছ ধরার চাই তৈরিতে চারু ও কারুকলার প্রকাশ বেশ সুন্দর। কারুশিল্পের উন্নত নির্দশন হিসেবে চাই সমাদুর পেয়ে এসেছে। মুর্তা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি হয় শীতলপাটি। পাটিতেও কারুশিল্পীরা বুনটের মাধ্যমে নকশা ও চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।

বাংলাদেশের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে রয়েছে সৌতাল, ঝুঁড়াও ও রাজবংশীয়া। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুরে বসবাস করে গারো ও কোচ। খাসিয়া, মণিপুরী, ত্রিপুরারা বাস করে সিলেট অঞ্চলে। বরিশালে বাস করে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে রয়েছে অনেক আদিবাসীদের বসবাস। এরা হলো— চাকমা, মারমা, তনেছঙ্গা, বম, বোমাং, ত্রিপুরাসহ আরো অনেক। এরা উচু নিচু পাহাড়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে। পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরা নিজেদের বসবাসের ঘর তৈরি করে। যা স্থাপত্য ও কারুশিল্পের সুন্দর প্রকাশ। এরা চামবাস করে ঢালু পাহাড়ের গায়ে। চামের পদ্ধতির নাম জুম চাষ। নিজেরাই বিশেষ করে মেয়েরা ঘরে বসে তাঁতে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরি করে। আদিবাসীদের লোকজীবনে সর্বত্রই চারু ও কারুকলার প্রকাশ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে চারু ও কারুকলার চৰ্চা বিভিন্ন শিল্পবস্তু তৈরি এবং শৈল্পিক বস্তুসামগ্ৰীর ব্যবহার লোকায়ত। অর্ধাং জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশী চারু ও কারুশিল্পীদের তৈরি করা বস্তুসামগ্ৰী জাতি, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করে এসেছে। সব ধর্মের মানুষই শিল্পকর্ম তৈরি করে থাকে।

বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সাধারণ মানুষ অসাম্প্রদায়িক। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ পাশাপাশি একই সঙ্গে বসবাস করার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। একে অপরের কাজে সহযোগী। ভাগভাগি করে অনেক কাজই সমাধা করে বিভিন্ন ধর্মের প্রধানরা।

একজন হিন্দু কামারের তৈরি—দা, কুড়াল, খস্তা, কাঁচি ইত্যাদি মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা নির্দিধায় ব্যবহার করে। একজন কুমার—যে হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাঁর তৈরি মাটির ইঁড়ি—পাতিলে রান্না করে খেতে মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষের কোনো আপত্তি নেই। তাঁর তৈরি মাটির কলসি থেকে সবাই আনন্দের সঙ্গেই পানি পান করে।

আদিবাসী মেয়েরা তাঁতে তাদের সুন্দর পোশাকের কাপড় বুনে নেয়। রং, নকশায় ও বৈচিত্র্যে আদিবাসীদের তৈরি কাপড় ও পোশাক সমতলের সব ধর্মের মানুষদের কাছেই আকর্ষণীয়। বিশেষ করে তাদের তৈরি চাদরের কদর সারা বাংলাদেশে। সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সব লোকই সমান আরাম পায় এবং ঠাণ্ডা থেকে সমানভাবেই রেহাই পায়। সোনা, রূপার অলঙ্কারে নিখুঁতভাবে নকশা খোদাই করার কাজে বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা

খ্যাতি অর্জন করেছে। সবধর্মের মানুষের মধ্যেই অলঙ্কার শিল্পের কারিগর বা কারুশিল্পী রয়েছে। একজন মানুষ অনেক খুঁজে ও অনেক বেছে তার পছন্দের অলঙ্কারটি সঞ্চাহ করে। তার পছন্দ, রূচি ও শিল্পবোধই তাকে বাছাই করতে সাহায্য করে। তার বাছাই করা অলঙ্কারের নিখুঁত নকশা খোদাই ও সুন্দর কারুকাজের জন্য তিনি অলঙ্কার শিল্পীকে সম্মান দেখান- প্রশংসা করেন। শিল্পের জন্যই তিনি কারিগরকে প্রশংসা করেন। অন্য কোনো কারণে নয়।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি উৎসব হয়ে থাকে। যেমন- মুসলমানদের ঈদ উৎসব, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বৃদ্ধপূর্ণিমা, খ্রিস্টানদের বড়দিন। ধর্মভিত্তিক হলেও অন্যান্য ধর্মের মানুষ নানাভাবে সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা আছে। তা সহেও তারা বাংলা ভাষায়ও কথা বলে। এই বাংলাভাষার কারণে আমাদের সাহিত্য, গান, নাটক, যাত্রাপালা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি লোকায়ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান। সব ধর্মের মানুষদের মধ্যেই তা বিস্তৃত। চারু ও কারুকলা বিষয়টিও সমানভাবে লোকায়ত।

সৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিরা একতাবন্ধ হয়ে ২৩ বছর ধরে সংগ্রাম করেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। বাঙালিরা বাংলাভাষা, চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লোকায়ত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে বিজাতীয় ভাষা, পাকিস্তানি উচ্চট সংস্কৃতি তথা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক চিঞ্চা-চেতনা জোরজুলুম করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭১ সালে সামান্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়েই পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। নয় মাস যুদ্ধ করে বিপুল অস্ত্রসম্পর্ক সজ্জিত শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাদের পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। বাঙালির লোকায়ত বৈশিষ্ট্যও ভাষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির মিলিত চেতনাই ছিল প্রধান মানসিক শক্তি ও মনোবল।

দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিরা বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখকে অনেক ঘটা করে পালন করে এসেছে। পহেলা বৈশাখ এখন বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। শহরে, গ্রামে সর্বত্র এই উৎসব ও মেলা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। পহেলা বৈশাখের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দুই-তিনি মাস আগে থেকেই চলতে থাকে। ঢুলিনা তাদের দল গঠন করে, শিশুদের আনন্দের খেলা বুল্লত চেয়ার সূর্ণি, যাত্রাপালা, মাচ, গান অভিনয় মঞ্চে নিজেদের তৈরি করে। অন্যদিকে কুমার তাদের চাকায় নানারকম মাটির পাত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়, শখের ইঁড়ি, লক্ষ্মীসরা, কাঠ ও বাঁশের অনেক কারুশিল্প ও খেলনা তৈরি হয় মেলার জন্য। যেমন- রঙিন হাতি, ঘোড়া, বর-কনে, একতারা, দোতরা, তবলা, ছেট-বড় অসংখ্য ঢেল, বাঁশের বাঁশি নানারকম খেলনা ইত্যাদি। গ্রামীণ জীবনকে বিষয় করে চারুশিল্পীদের আকা নানারকম পট (চিত্র) গাজীরপট খুবই বিখ্যাত চারুশিল্প।

ঢাকা শহরে বাংলা নববর্ষকে প্রথম আহ্বান জানানো হয় রমনার সবুজ চতুরের বটতলায়। পহেলা বৈশাখে সূর্য উঠার আগে লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে এই বটমূলে। শিশু, মহিলা, তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সের মানুষ নতুন নতুন পোশাকে সুন্দর সব সাজে অপেক্ষা করে কখন নতুন বছরের সূর্য উঠবে। শুধু সংস্কৃতিচর্চার শক্তিশালী ভিত্তি দাঁড়ানো প্রতিষ্ঠান ছায়ানট প্রতিবছর আয়োজন করে এই উৎসবের। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা গেয়ে উঠে- এসো হে বৈশাখ- এসো এসো...

ছায়ানটের শিল্পীদের সঙ্গে কর্তৃ মিলায় হাজার হাজার কর্তৃ-না লক্ষ কর্তৃ।

একের পর এক গান চলতে থাকে- মানুষের প্রাণের গান, ভালোবাসার গান, উদ্দীপনার গান, বেঁচে থাকার গান। প্রাণ ভরে উপভোগ করে ছায়ানটের এই বিশাল আবেদন- বিশাল আয়োজন।

পহেলা বৈশাখের প্রতাঞ্চ সূর্যকে আহমান আনিয়ে আত্মা কিছু সাতকৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুসূচি অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এরা হলো বিভিন্ন সাতকৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী, রাবিরাশ, সুজোরধারা সহ আত্মা অনেক প্রতিষ্ঠান।



চারু বিশ্বিদ্যালয় চারুকলা অনুষ্ঠানের বালা নববর্ষে ‘মঙ্গল পোতাযাত্রা’

চারুকলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারু বিশ্বিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষ্ঠান প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বালা নববর্ষ উৎসবকে বিশাল পোতাযাত্রা (মঙ্গল পোতাযাত্রা)। মূলীদের চোলের ভালে ভালে মাটতে মাটতে আলদ-উল্লাসে এগুতে থাকে পোতাযাত্রা। চারু ও করুশিল্পীয়া তৈরি করে লোকশিল্পের আদলে বিভিন্ন অঙ্গভূক্তির সব ভাস্কর্য। হাতি, ঘোড়া, ঝুমির, পেঁচা, সাপ, মোরা, মাছ, ফুল, পাখিসহ অনেক কিছু। বিশাল আকাশে তৈরি হয় লোকশিল্পের এই ভাস্কর্য— যা প্রতীকী। কিছু আছে কুটিস, মোঁটী, আসবদর, রাজাকরণের আদল, কিছু আছে—ভালো, সৎ মানুষের আদল— যারা মানুষের মঙ্গল চার। চারু ও করুশিল্পীদের এই বৰ্ণাত্য বালা নববর্ষের পোতাযাত্রা দেশের গতি ছাড়িয়ে বিদেশের মানুষের কাছেও সমাপ্ত।

বালা নববর্ষের উৎসব সামা বালাই— ধার্মে—গঁথে শহরে আলদ উল্লাস নিয়ে গালিত হচ্ছে।

লোকসঙ্গত ও সর্বজন শাহ্য অন্যান্য উৎসব হলো— একুশে ক্রেতুরাবি উৎসবালম্বন। ভাবালশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও সর্বাল আলাদার প্রতীকী ধারি পায়ে প্রভাতকেরি, রাস্তার ও শহিদমিনার চতুরে আলপনা ধীকা। প্রতি বছরই চারুশিল্পীয়া আলপনা থাকে, আলপনা ধীকা রাস্তায় ধারি পায়ে মানুষ হেঁটে বায় ফুল হাতে শহিদমিনাজোর দিকে—কঠে থাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসৰ গান— আমার তাইজের রঙে রাখানো একুশে ক্রেতুরাবি, আমি কি ভূলিতে পারি।

২৬শে মার্চ ১৯৭১, জাতির অনেক বজ্ঞাবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমান ছড়াত্ত্বাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই দিন থেকেই বাঙালিরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। দেশকে স্বাধীন করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। এই দুটো দিনকে বাঙালি জাতি আনন্দ উত্তাসে শহিদ মুক্তিযোৰ্ধাদের অরণ করে উৎসব করে।

বাংলাদেশের সর্বত্র অনেক নদী। এই নদীকে বিরে যে উৎসব হয় তা হলো নৌকাবাইচ। কারুশিল্পীরা সুন্দর ও চমৎকার সব আদলে ও নকশায় কাটোর নাও তৈরি করে। নৌকাবাইচ উৎসবের সঙ্গে রয়েছে—তাঙের গান, চোল, বাঁশি ইত্যাদি। লোকায়ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিতে উত্তোলিত উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানগুলো (পহেলা বৈশাখ, নবাবু উৎসব, বসন্ত উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নৌকাবাইচ) বিশেবভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে চারু ও কারুকলার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে।

পাঠ : ৭, ৮, ৯ ও ১০

পেশাগত জীবনে চারু ও কারুকলার প্রয়োগ

শোকশিল্প বলতে আমরা যে শিল্পকলাকে চিহ্নিত করি তা আমাদের গ্রামগঞ্জের শিল্পীরা একসময় যথাহৰ পেশা হিসেবে বিচার করত না। যেমন নকশিকাঁধা প্রামের মেয়েদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বা অন্য কোনো গুরু সে মনের মাধুরী মিশিয়ে রাখিল সুতো ও সূচ সিয়ে দিনের পর দিন সময় নিয়ে কাঁধায় ফুটিয়ে তুলত। এক-একটি সময় ঠিক করে সে নকশিকাঁধা নিয়ে বসত। এই কাঁধা বিক্রি করা তার পেশা ছিল না। কাঁধা নিজের জন্য বা কোনো পিল মানুষের জন্যই সে তৈরি করত।

একইভাবে শখের ইঁড়ি, টেরাকোটা, টেপা পুতুল ও পাটের শিকা, হাতপাখা ইত্যাদি নিজেদের আনন্দেই শিল্পীরা করত। ধীরে ধীরে লোকজীবনে এসব শিল্পের কদম বাঢ়তে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে বাংলার অনেক শোকশিল্প ও কারুশিল্পের সঙ্গে মিশ্রিত রূপ নেয়। নকশিকাঁধার অন্তর্যামা এখন দেশে ও বিদেশে সর্বজ্ঞ। তাই নকশিকাঁধাকে কেন্দ্র করে কিছু পেশাজীবী শিল্পী তৈরি হয়েছে।



পোড়ামাটির ফশকচিয়া বা টেরাকোটা

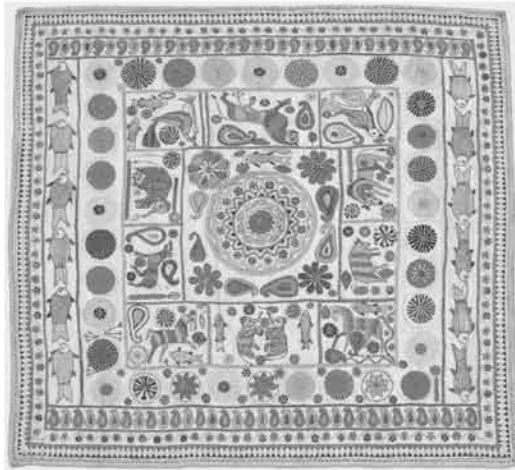
এদের মধ্যে আমের মেয়েরা যেমন আছে তেমনি শহরের মেয়েরাও রয়েছে। এমন কী চারুকলা থেকে পার করা শিল্পীরাও নকশিকাঠা তৈরি করাকে শিক্ষকর্মের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জীবনে— কামার, কুমার, তাতি এরা কারুশিল্পে পেশাজীবী। বাঁশ, কাঠ, খড়, পাতা ও পাট দিয়ে নানারকম খেলনা, শব্দের জিনিস এমন কী লোকজীবনে ব্যবহারের অনেক বস্তুসমূহী তৈরিতে স্বশিক্ষিত শিল্পী এবং চারুকলার শিক্ষাগ্রাহ শিল্পীরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন ডিজাইনে ও চিত্র বিচিত্র সাজসজ্জায় পোশাকশিল্পকে অনেক আধুনিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে চারুকলার শিল্পীরা। যা দেশের পাঞ্জ পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানিক চারুকলার চর্চার শুরুতে (৫০-৬০-এর দশক) চারু ও কারুশিল্পীদের জন্য পেশা হিসেবে তেমন কোনো কাজ লোকজীবনে অনুভূত হতো না। দিনের পর দিন চারুশিল্পীরাও সংস্কৃতি জগৎ—এর মানবের চিন্তকলার প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্পের গুরুত্ব সমাজকে বুঝাতে পেতেছে। একটি উন্নত সমাজে ডাঙুর, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী এমনি পেশার মানুষ যেমন প্রয়োজন, পাশাপাশি প্রয়োজন স্বপ্নতির, চিত্রশিল্পীর এবং সংস্কৃতির মানুষের। পেশাগতভাবে চারু ও কারুশিল্পীরা বর্তমানে অনেক আগিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই চারু ও কারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে চারুকলা বিদ্যার বিভাগ। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে চারুকলা চর্চার। নিম্নপর্যায় থেকে শিক্ষার একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত চারু ও কারুকলায় বহু শিল্পী শিক্ষকতা পেশার নিরোধিত।

বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে অনেক আগে থেকেই। চিত্রশিল্পীদের আকা ছবির সমাদর দেশে—বিদেশে ব্যাপৃত। সমাজে শিক্ষাবোধ ও সংস্কৃতি চেতনা উন্নয়নের সমূদ্ধির পথে। অনেক ব্যবসায়ী শিল্পকর্ম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ফলে সংস্কৃতিবানরা অর্ধের বিনিয়নে ছবি সঞ্চাহ করছেন। কারুশিল্প সঞ্চাহ করছেন। তাদের বসবাসের আবাসে চিত্র সাজাচ্ছেন, কারুশিল্প সাজাচ্ছেন, স্থাপন করছেন ভাস্কর্য। অফিস প্রতিষ্ঠানের চতুরে ভাস্কর্যশিল্প প্রতিস্থাপন করে, প্রতিষ্ঠানের ভবনের দেয়ালে চারু ও কারুশিল্পীদের দিয়ে সৃজনশীল মূরাবাশিল্প স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পী বিজ্ঞাপনী সংস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। টেলিভিশন মাধ্যমে শিল্পীরা অনুষ্ঠানের পটভূমিকে চমৎকার নামদিনিকতায় তুলে ধরে প্রতিটি অনুষ্ঠান আনন্দময় ও সুখকর করে তুলতে পারছে। সংবাদপত্রের জন্য চিত্রশিল্পী অবশ্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন চলচ্চিত্রশিল্পে। বাণিজ্যিক ও শিল্প মেলায় শিল্পীরা চমৎকার আকার—আকৃতি ও নকশায় প্যানিলিয়ন, গেট স্টেল তৈরি ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে যাচ্ছেন। বাঢ়ি, অফিস, দোকান, সুপার মার্কেটের অভ্যন্তরীণ নকশা, সাজসজ্জা চারু ও কারুশিল্পীরা নিপুণভাবে সমাধা করছে।

তাই নির্ধিধার বলা যায় চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটার কারণে পেশা হিসেবে শিল্পীর গুরুত্ব সমাজে তথ্য দেশে ত্রুটি সমূদ্ধির পথেই এগুচ্ছে। নিষ্ঠকোচে ত্বরণ প্রজন্ম চারু ও কারুকলাকে পেশা হিসেবে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করছে।



নকশিকাঠা

পাঠ : ১১, ১২, ১৩ ও ১৪

লোকজীবনে সম্মৃত বিভিন্ন শিল্পকর্ম

লোকজীবনে সম্মৃত বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে পূর্বের বিভিন্ন আলোচনায় প্রায় সর্বত্র বলা হয়েছে। শিল্পকর্মগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে।

১. লোকশিল্প : পোড়ামাটির ছেট-বড় পুতুল, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, কাঠের তৈরি হাতি, ঘোড়া, মানুষ, পাখি, নকশিকাথা, সরাচিত্র, মাটির রঙিন পুতুল, মাটির খেলনা, শীতলপাটি, শখের ইঁড়ি, গল্লের চিত্র, গাজীরপট ইত্যাদি।

২. কারুশিল্প : দা, কুড়াল, কোদাল, পোড়ামাটির ইঁড়ি, পাতিল, শানকি, বাটি, মাটির তৈরি ব্যাংক, মটকা ইত্যাদি। বাঁশের তৈরি টুকরি, খাচা, বাঁকা, ছেট বড় বাঁশি, ঝুঁকো, মাছ ধরার চাই, মাথাল, ঘরবাড়ির জন্য নানারকম নকশা ইত্যাদি। কাঁসার থালা, ঘটি, পিতলের কলসি ইত্যাদি। সোনা, বুপার অলঙ্কার, তামার পাত্র। বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্প বেশ সমৃদ্ধ। ঘরের দরজা-জানালার কপাট, খাট, পালং ও আলমারির গায়ে ফুল-পাখির ছবি, লতাপাতা এমনকি লোকজীবনের দৃশ্য নিপুণভাবে কাঠ খোদাই করে রিলিফ শিল্পকর্মগুলো উন্নতমানের কারুশিল্প। বাংলাদেশের নদীতে ও সমুদ্রে চলাচলের ছেটবড় নানা অবয়বের নৌকা বাংলার কারুশিল্পীরা করে থাকেন।

বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, সোফা, চেয়ার, টেবিল, মোড়া উন্নতমানের কারুশিল্প।

বাঁশ, কাঠ, লোহা, ঢিনের পাত ও প্লাস্টিকের সমন্বয়ে তৈরি হয় যানবাহন রিকশা। রিকশার কারুকাজ সৌন্দর্যস্ফূর্তি ও নান্দনিক বুপের জন্যে দেশে-বিদেশে নদিত। জাপান, বৃটেন, আমেরিকা ও কানাডায় রিকশার কারুকাজের প্রদর্শনী হয়েছে। রিকশার পেছনে শিল্পীরা যে ছবি আঁকেন সেই চিত্রকলাও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসন অর্জন করেছে।

লোকজীবনের সঙ্গে সম্মৃত আধুনিক চিত্রকলা, নকশা, পোশাকশিল্প, সিরামিক শিল্প, ইলেক্ট্রিয়েল ডিজাইন, ভাস্কর্য, মুরাল এবং স্থাপনা শিল্প।



বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের অনেক প্রদর্শনী হচ্ছে। ভাস্কর্যের ও আধুনিক কারুকলার প্রদর্শনী হচ্ছে। সংস্কৃতিবান রুচিশীল মানুষ ও শিল্পের সমবাদার মানুষের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাঁরা শিল্পকলা-তথা চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলা অর্থের বিনিয়য়েই সংগৃহ করছেন। নিজেদের বাড়ি, ঘর, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাজাচ্ছেন। শিল্পকলা তাঁদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পশুর চামড়া দিয়েও নানারকম কারুশিল্পের কাজ হচ্ছে। চামড়ার ব্যাগ, জুতা ও পোশাকের দেশে যেমন কদর বিদেশেও তেমনি।

নমুনা প্রশ্ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে লোকশিল্প হলো—

- ক. নকশিকাথা, শখের ইঁড়ি
- গ. বাঁশ ও বেতের ঝুঁড়ি

- খ. তামা-কাসার তৈজসপত্র
- ঘ. উপরের সবগুলো

২। বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব কোনটি?

- ক. বড়দিন
- গ. দুর্গাপূজা

- খ. বুধপূর্ণিমা
- ঘ. টীক

৩। টেপা পুতুল কিসের তৈরি?

- ক. মাটির
- গ. লোহার

- খ. প্লাস্টিকের
- ঘ. কাঠের

৪। জুম চাষ কোথায় করা হয়?

- ক. নদীর তীরে
- গ. পাহাড়ের ঢালে

- খ. সমতল ভূমিতে
- ঘ. সমুদ্রের তীরে

৫। মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করে—

- ক. চারুকলা অনুষদ
- গ. শিল্পকলা একাডেমি

- খ. বাংলা একাডেমি
- ঘ. শিশু একাডেমি

লিখে জবাব দাও

১. বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা—শহরে বিষয়টি কীভাবে দেখা হয়—বর্ণনা দাও।
২. গ্রামীণজীবনে চারু ও কারুকলার প্রয়োজন সমস্কৈ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩. লোকায়ত বালার চারু ও কারুকলার অবস্থান ও ব্যবহার নিয়ে সংক্ষেপে লেখ।
৪. বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ-বালা নববর্ষ উদযাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৫. বারো থেকে পনেরটি বাক্যে জবাব লেখ।
 - ক. গ্রামের বৈশাখী মেলা।
 - খ. ছায়ান্টের ১লা বৈশাখ উদযাপন।
 - গ. চারুকলা অনুষদে মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মেলা।
 - ঘ. চারুকলার শিল্পীরা কোন কোন পেশায় কাজ করে চলেছে।
 - ঙ. লোকশিল্পী ও লোকশিল্প।
 - চ. বাঁশ, বেত ও কাঠের কারুশিল্প।
 - ছ. সমাজে একজন চিত্রশিল্পীর গুরুত্ব।
৬. সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ
কামার, কুমার, নকশিকাঠা, নৌকাবাইচ, আলপনা, একুশে ফেরুয়ারি, রিকশা, কাঠে খোদাই করা শিল্পকর্ম, পাটের শিল্প, হাতপাথা।

চল্লিশ অধ্যায়

আৰক্তে হলে জানতে হবে



শিল্পীর কল্পনা দ্বাৰা চৰিত চিত্ৰণ

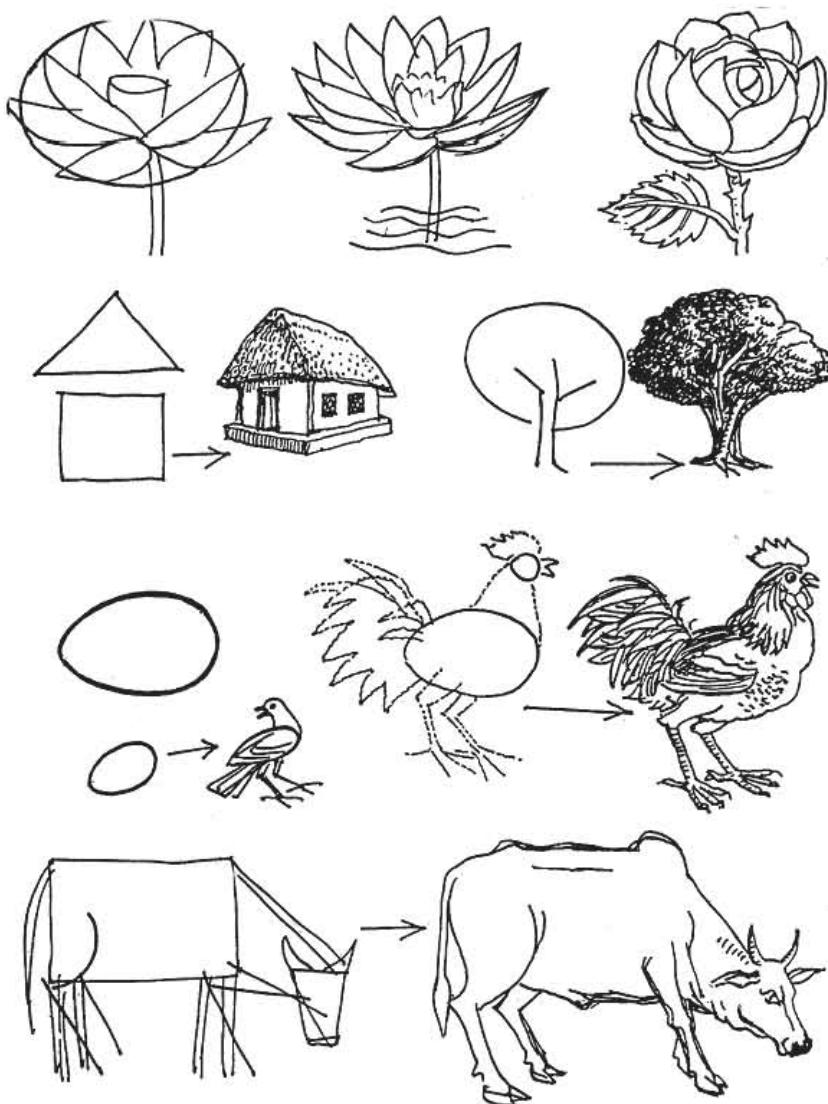
এ অধ্যায়ৰ পুঁজি দেৱ কৰাবলৈ আপোনা—

- কৃষি বীকৰৰ নিমামনুচেয়ে বাধাৰা কৰতে পাব।
- কৃষি বীকৰৰ পিতিঙ্গু উপকৰণৰ বৰ্ণনা লিখে পাব।
- কৃষি বীকৰৰ পিতিঙ্গু কাঠৰ ও কাৰ ব্যৱহাৰৰ সম্বৰ্দ্ধ বৰ্ণনা কৰতে পাব।

পাঠ : ১

ছবি আকার নিয়ম

যষ্ট শ্রেণিতে আমরা ছবি আকার সাধারণ নিয়মগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, ছবি আকারে হলে বস্তু বা বিষয়ের আকৃতি, গড়ন, অনুপাত ইত্যাদি খেয়াল করে প্রথমে ছাইং করে নিতে হয়। পৃথিবীর বাবতীয় বস্তুকেই তিনটি আকৃতিতে ফেলা যায়। সেগুলো হচ্ছে বৃত্ত, ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ। কোনটি কোন আকৃতিতে পড়বে তা তাগোভাবে বুঝে নিয়ে আকৃতি ঠিক করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ছাইং করার পদ্ধতি— আকার—আকৃতি, অনুপাত ও পরিপ্রেক্ষিত এর মূলিক সম্পর্কে জানব। সেই সাথে ছবিতে কল্পাঞ্জিল ও আলোহাত্মক পুরুষ ও এর সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে জানব।



আকার—আকৃতি, বস্তুর বৃত্ত ও আদল কেমন, পোকাকার, চারকোণা বা তিনকোণা?
ভালো করে দেখে তারপর আৰুকৰ্তে হয়।

৩৫.

কোনো বস্তু বা বিষয়ের ছবিকে শুধু জো দিয়ে কালজে বা ক্যানভাসে খোকাকে ছাই করে। এই ছাই পেনসিল, কলমে, কাঠ কম্বলৰ বা চূলি দিয়ে করা হয়। বাস্তবে কোনো বস্তুর, জীবজগত ও পাহাড়গুলো গায়ে কোনো জো নেই। বে জো আমরা আর্টি-ছাই করার অন্য কা হলো— দলে কর একটি কলসি। কলসিটি পোল—এর একটা আকর্ষণ ও আকর্ষণ আছে। কলসি কেশ খানিকটা আয়ো দখল করে অক্ষরান করে। আবরা এই কলসিকে কালজের সমতলভূমিতে কঢ়েকটি জো দিয়ে স্ফুটিয়ে দূলি। এই জো হলো আমাদের দৃষ্টির সীমাবেধ। কলসিটি সাধারে দিকে অনেকখনি দেখায় পর আৰ আমরা দেবি না। দৃষ্টি দেখালে আটিকে যায় সেৰানেই জোকে অনুযান করে নিই। এভাৰে শোক, নদীনামা, পাহাড়গুলা, জীবজগত, সাধারণকোষ্ঠা সবকিছুই আমরা ধীমতভাৱে দেখতে অচলস্থ বা আমাদেৱ কো এভাবেই দেখতে বাধ্য করে। দৃষ্টি দেখানে আটিকে যায় সেখানে কানিক জো দিয়ে কালজের সমতলভূমিতে সবকিছুই স্ফুটিয়ে দূলি। এই ছবিকে আরও নিখুঁত ও সুস্পষ্টভাৱে স্ফুটিয়ে তোলা হয় আপোছায়াকে টিক্কতাৰে ঘৰে।

ঝঃ, আপোছায়া বা শুধু জো দিয়ে কালজের সমতল ভূমিতে ছবি খোক হলোও বিপৰুলোৱ উজ্জ্বল, আয়োজন ও আকর্ষণ বৃক্ষতে কষ্ট হয় না। অৰ্থাৎ কলসি বে পোল, এৰ তজন আছে এবং খানিকটা আয়ো দখল করে থাকে, এসব সমতল কালজে জো দিয়ে খোক হলোও বৃক্ষতে কষ্ট হয় না। তাই নিখুঁত ছবি স্ফুটিয়ে তোলার অন্য ছবি আৰুৰ কৰেকটি অপৰিহাৰ্য বিষয় ও সিন্ধুৰ সম্পর্কে সচেতন হকে হয়। সেখুলো হলো—

- ১। আকর্ষণ ও আকৃতি
 - ২। অনুগ্রাহ
 - ৩। পরিপ্রেক্ষিত
 - ৪। কল্পনাজ্ঞিত্ব
 - ৫। আপোছায়া
 - ৬। ঝঃ
- ১। আকর্ষণ ও আকৃতি : আমাদেৱ চাইগাণে দেখব জিনিস রয়েছে— পাহাড়া, জীবজগত, সবকিছুই নিজম আৰুৰ ও আকৃতি রয়েছে। কোনোটা পোলাকাৰ, কোনোটা সম্মাট, কোনোটা চাইকেণা বা তিসকেণা ইত্যাদি। একটু তালো কৰে লক কৰে দেখবে আৰ সব জিনিসই উপত্যে উচ্চিতি আকৃতিৰ মধ্যে পড়ে। বেমন— হৃল, কল, পাই এসব পোলাকাৰ। শব, বাঢ়ি, লৌকা ইত্যাদি চতুর্ভুজ ও হিমুজেৱ আকাৰে দেলা হাত। পাখি প্রায় সবই ডিশ্যাকৃতি (পোলাকাৰেৱ তিক্রণ)।

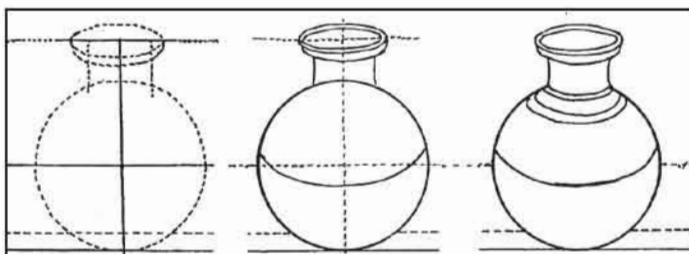


ছবিক অনুগ্রাহ টিক্কতো স্ফুটিয়ে স্ফুটত না
পোলে উপত্যে হুকিৰ মতো অবস্থা হয়

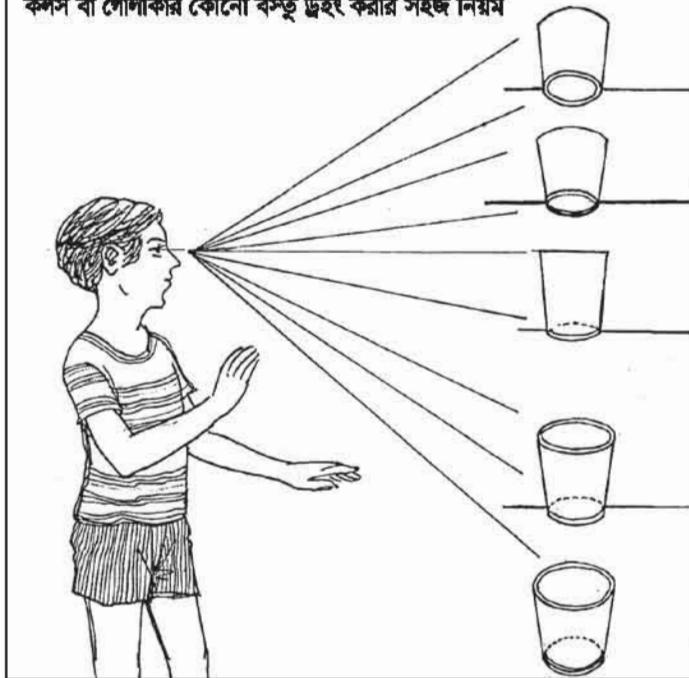
২। অনুগাত : ছবি আঁকার বিষয়ে ‘অনুগাত’ একটি অতি জরুরি বিষয়। অনুগাত ছাড়া ছবি নির্ণৃত হয় না। যেমন— একটি কলস শরীরের ভূলনায় কলসের মুখ ও ঘাড়ের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। শরীরের ভূলনায় মুখ ও ঘাড় কভার্ট ছেট—বড় হবে তা ভালোভাবে দেখে ঠিক করে নিতে হবে। একজন মানুষের শরীরের ভূলনায় তার হাত, গা, চোখ, কান ইত্যাদি কী মাপের হবে তা সুনির্দিষ্ট করে আঁকতে হবে। আবার একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে— অনেক গাছপালা, জীবজন্তু ও জিনিসপত্র থাকে। তাদের প্রত্যেকেই একটি নিজস্ব বিশেষ আকৃতি ও মাপ রয়েছে। ভূলনায় কভার্ট কোনটি বড় হবে, কোনটি ছেট হবে তা ভালোভাবে লক করে ছবিতে সাজাতে হবে।

পার্ট : ২ ও ৩

৩। পরিপ্রেক্ষিত : বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার জন্য পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োজন। পরিপ্রেক্ষিত ঠিকমতো ছবিতে উপস্থাপন করতে না পারলে বা ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সে ছবি সত্যিকারের বাস্তব ছবি হয়ে ওঠে না। আমাদের চোখ, সে চোখে দেখা, দেখার নানারকম ভঙ্গি, এ সবের উপরই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর করে। যেমন— একটি কাচের গ্লাস মেঝেতে রেখে তুমি তা



কলস বা গোলাকার কোনো বস্তু ছুইঁ করার সহজ নিয়ম

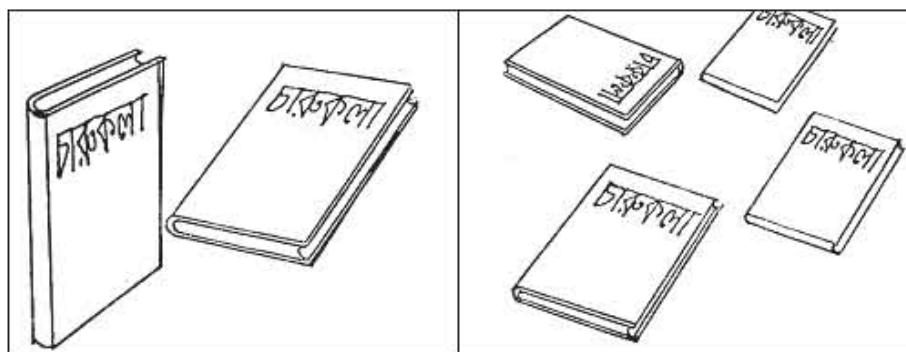


পরিপ্রেক্ষিত বা পরস্পেকটিভ।
চোখের সমান্তরালে আমরা কোনো বস্তু যেভাবে দেখি।

দেখছ। তুমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে কাচের গ্লাসটি ধীরে ধীরে কয়েকটি পর্যায়ে উপরের দিকে তুলে ভালো করে দেখ। যখন যেমন— দেখছ, প্রত্যেকটি পর্যায়ের অবস্থানের হুবুব ছবি আৰ। এক পর্যায়ে গ্লাসের উপরিভাগে তোমার চোখের সমান্তরালে অবস্থান করে ছবি আৰ। এবার গ্লাসের সবগুলো অবস্থানের ছবি মিলিয়ে দেখ। তোমার দেখার ভঙ্গির জন্য একই গ্লাসের কত রকম রূপ রয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে তোমার পড়ার টেবিলে একটি বই রেখে ভালোভাবে দেখ— বইয়ের অবস্থান কীভাবে রয়েছে। এবার দেখে দেখে বইটির ছবি আৰ। একই বইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে রেখে আৰ। এবার সবগুলো ছবি মিলিয়ে দেখ একই বইয়ের কত রকম রূপ হয়।

আগের বইটির সমান আকারে আরও দুটো বই সামনে—পেছনে করে সাজিয়ে একই নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভালোভাবে



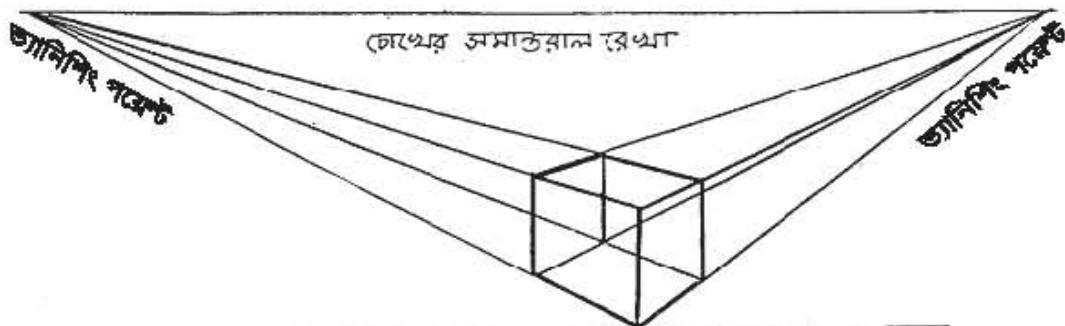
এই বই তিনি অকথানে তিনি চেহারা।

একই মাপের বই সূরত ও অকথানের
কারণে ঘোট বড় হয়ে যাচ্ছে।

লক কর। সামনের বই বত বড় মনে হবে, পরেরটি মনে হবে আরও হোট আরও সূর্য বে বই সেটি মনে হবে আরও হোট। অর্থাৎ বই সূর্যে যাচ্ছে ক্রমশ হোট হয়ে যাচ্ছে। এই একই মাপের বই অথচ এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যন্ত। তোম আমাদেরকে এভাবেই দেখতে বাধ্য করে।

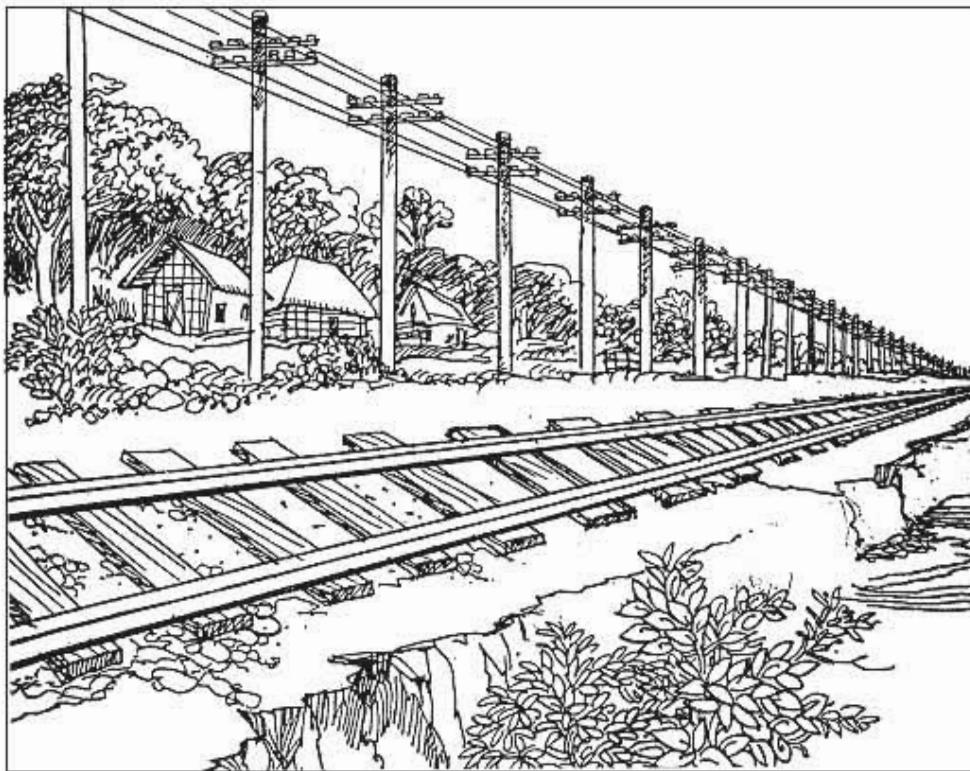
তোমার যত্নের জ্ঞানালো সিয়ে বাইজে ভাবাও। খেলার ঘাঁট, বালার, গাছপালা, রাস্তা, যান্ত্ৰ-এমনি অনেক কিন্তুই একসঙ্গে চোখে পড়বে। অথচ জ্ঞানালোর যাপ কত? বড়জোড় চারফুট লম্বা ও তিনফুট চওড়া।

জেলাইন তালো করে লক করে দেখ। কাঠের টিপাড়ের উপর সিয়ে লোকের দৃঢ়ো শাইন সূর-সূরাণ পর্যন্ত চলে সিয়েছে। শাইন দৃঢ়ো পাশাপাশি সমান সূরতে জেখে কসানো হয়েছে। কোথাও এক ইঞ্জিন-সেদিক হওয়ার উপর নেই। আর সামান্যতম বাতিক্রম হলে ট্রেন চলবেই না। এমনি এক জেলাইনে দৌড়িয়ে ঝুঁমি সামনের সিকে ভাকাও।



সব দিকে সমান এই চারকোণ বাজ একে পরিপ্রেক্ষিত বুঝানো হয়েছে।

জেলাইন সোজা পথে বেধানে অনেক দূর চলে সিয়েছে সেৱকম জ্ঞানগু দেখে দৌড়াবে। বেধানে জেলাইন বাঁকে যুক্তে— দেখানে নৰ। দেখবে পাশাপাশি সোজার শাইন দৃঢ়ো ধীজে ধীজে এক কিন্তুতে সিয়ে লেব হয়েছে। জেলাইনের পাশে বে টেলিফোনের ভাঁজের ধারপুলো পরপর রাখেছে সেপুলোও একই সমান্তরাল রেখায় একই কিন্তুতে এসে যিপে বাবে। মাথার উপরে আকাশ ও মাঠ-ঘাট, গাছপালা সবই দেখবে তোমার চোখের সমান্তরাল রেখার আগের সেই কিন্তুতে এসে যিপে বাবে। অর্থাৎ তোমার দেখার সীমানা এই কিন্তুতে লেব হয়েছে— যে কিন্তু তোমার চোখের সমান্তরাল রেখার। এই কিন্তুকে ইংৰেজিতে বলে 'জ্ঞানিশি পহেল'। চোখের সমান্তরাল রেখাকে বলে 'জ্ঞাইন শাইন'। বালার কথা যাই 'দিশত জোখা'। দিশত জোখা মাঠে বা বড় নদী ও সাগৰ তীরে দৌড়ালে আরও পরিষ্কার বুববে।



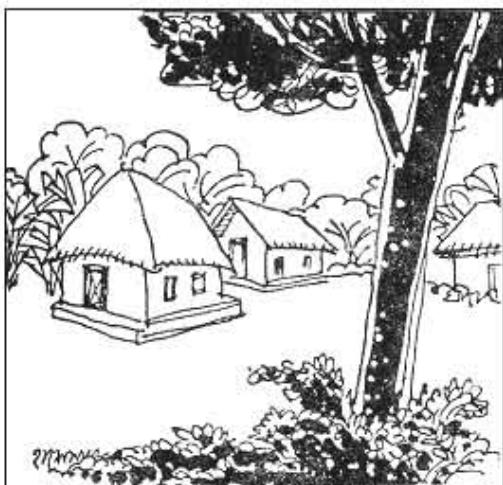
জেল সাইনের কাছে মৈত্রির সেবার পরিষেকিত বিবরণটি আলোভাবে সূচা বার।

পরিষেকিত শুধু আকার আকৃতির ছেটি-বড়, সাথনে-শিহনে ও সূর্য বুরাবার জন্য বেমন প্রয়োজন কেমনি রং ও আলোভাবার ক্ষেত্রেও আবশ্যিক। ছবিতে সাথনের সিকে রং বড় উজ্জ্বল ও প্রখর হবে; যদই সূর্য বাবে রং ধীরে ধীরে প্রাপ্ত হয়ে থাবে। বেমন, সাথনের পাছের গাতা বড় সুরু হবে, গোদ ও আলোভাবার প্রকাশ বর্তধানি প্রখর হবে, একশো গজ দূরে একই ধরনের পাছ আকারে বেমন ছেটি হয়ে থাবে কেমনি সুরু রং অনেক হালকা ও নীলের আভা মেশানো হবে। আলোভাবা ও গোদের প্রথমতাও অনেক বকসে আসবে। রং কক্ষটুকু প্রাপ্ত হবে বা হালকা হবে তা সঠিকভাবে ছবিতে কুটিয়ে তোলাই হলো পরিষেকিত। ছবিতে পরিষেকিত ঠিক হলেই সুই গাজের সূর্য যে একশ গজ তা সহজেই সূচে উঠবে। পরিষেকিত ঠিকমতো শক্তি করতে না পারলে হবি প্রাপ্তবীম হয়ে পড়ে।

পাঁচ : ৪

কল্পনাভিপ্নে

কল্পনাভিপ্নে ইত্যেকি শব্দ। যালা অর্ধ-চৰনা। যনে কর গুরু নিয়ে চৰনা দেখা হবে। গুরু সক্রাম পঞ্চিয় যাতে সঠিকভাবে প্রকল্প পাই, সেভাবে ভাৰা দিয়ে ঘূমি চৰনা তৈৰি কৰলো। ছবিৰ ক্ষেত্রেও ‘চৰনা’ বা কল্পনাভিপ্নে অনেকটাই ভাই। যনে কর, এই গুরু হবি আকতে শিরে কল্পনাভিপ্নে – কোমার কাপড়ের আকস্র অনুবাদী গুৰু কষ বড় কৰবে—গুৰুকে কপড়ের ঠিক যাবাখানে রাখবে না ঢান পাখে বা বায় পাখে উপজৰুৰ দিকে বা নিচৰু দিকে অৰ্ধাঙ্গ কষ কৰ



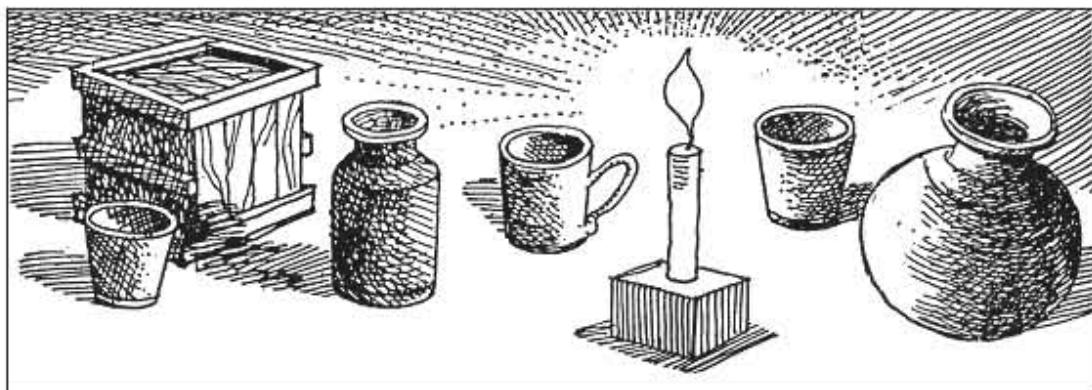
কল্পালিশন, একই বিবরকস্তু— তিনি তিনি সূচিকৰণ থেকে চার গ্রন্থগুলো
সাজানো হয়েছে। যেটি আমা ও সুন্দর সোটিই খোকতে হবে।

করে আৰকলে ও বাসন্তের কষ্টহৃদু আৱণা মিয়ে শৰূৰ ছবিটা সাজাসে ঘৰি দেখতে সুন্দর হবে— তা ঠিকমতো কয়াই হলো
হাজিৰ কল্পালিশন। ছবিৰ কল্পালিশন ঠিক কোৱা সময় ছবিয়ে বিষয়ে বেসৰ মানুষ, শীৰজস্তু বা অন্যান্য ছিনিস ধাৰক
তাৰ আকাৰ-আকৃতি, রং, আলোহার্যা এসব মনে আৰে বিষয়টি থাকে সুন্দৰতাবে ফুটিৰে তোৱা বাবে সেই ভাৱে সাজাতে
হবে এবং তালোভাবে ঠিকভাবনা কৰে ঠিক কৰে নিতে হবে। তাই, যে বিষয়ে ঘৰি আৰা হবে তাৰ অন্য অন্তত
তিনি গ্ৰন্থ বা চার গ্ৰন্থ কল্পালিশন ঘোট কৰাবে এইকে সকলুৰা পাখাপাখি আৰে ঠিক কৰতে হৱ কোনটি আৰকলে বেশি
সুন্দৰ হবে। সবনিক বিকেন্দনা কৰে যে কল্পালিশনটি ভালো হবে বলে মনে হয় সোটিই কঢ় কৰে মূল ঘৰি আৰকলে
হবে।

পার্ট : ৫

আলোহায়া

ছবি আৰম্ভ আলোহায়া একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক। ছবিতে আলোহায়াকে সাতিকভাবে মৃগ শিকে না পৱনে অধিবাল হয়ে পড়ে। আকৰ্ষণীয় হয় না। আমরা আপি সূৰ্য পূৰ্ব শিকে ঘটে, পশ্চিম শিকে অত বার। সূক্ষ্মাৰ আনুষ্ঠানিক মৃগ আৰম্ভ সময় জৰুৰ রাখতে হবে সূৰ্যৰ অক্ষয় আকাশে কেৌন আৰম্ভ। যে মৃগ আৰু হয়ে ভাতে গোদ কেৱলভাৱে পড়ছে। মৃগে গাহপালা, জীবজূ ও অস্যাম্য জিলিসের উপর ঝোলেৱ অক্ষয় এবং ভাসেৱ আৱা যানিকে কীভাবে পড়ছে তা আলোভাৱে দাঢ় কৰতে হবে। ধৰেৱ তেওঁজৰ ও ছায়াৰ দেশৰ বিবেৱে ছবি তাত্ত্বিক আলোহায়া থাকে। কোনো খিৰু জীবন, আনুৰ বা মূল্যানিসহ মূল, এ ধৰনেৱ দিব্য ঘোৱ কলে আৰু হয়। সৱজা-আনালা বা অন্য কোনোভাৱে আলো এসে এসেৱ উপৰ পড়বে। আলো কীভাবে এসে পড়ছে— তাৰপৰ থীজে থীজে হালকা বেকে গাঢ় হয়ে আৰো পৰে।



ছবিতে ‘আলোহায়া’ ব্যৰ্থব্যৰ্থভাৱে আৰক্ষে হবে। ক'পজৰ ছবিতে গোল ও হামা কীভাবে পড়ছে তা সেখানো হয়েছে। নিচেৰ ছবিতে—মোহৰাত্তিৰ আলোৰ প্ৰতিফলন ক'বিতিৰ ‘হামাৰ’ মৃগ।

ଆଲୋଛାମାର ସେ ତାରତମ୍ୟ ସଟି ତା ବିଶ୍ୱାସାବେ ଖୋଲ ଦେଖେ ଆକାଶ ହେ । ହରିତେ ଆଲୋଛାମାକେ ମୋଟାଯୁଦ୍ଧ ତିନଭାଗେ ତାଳ କରା ଯାଏ ।

୧ । ଖୁବ ବେଶ ଆଲୋ

୨ । ମାରାମାରି ଆଲୋ ଓ ଛାଙ୍ଗ

୩ । ହୃଦୟ ଛାଙ୍ଗ ଓ ପାଡ଼ ଛାଙ୍ଗ

ରାଜେର ଅନ୍ୟ ଆଲୋଛାମାକେ ତାରତମ୍ୟ ସଟି । ଏକଇ ହରିତେ ପାଶାଶାଳି ସବି ଶାଳ, ମୀଳ, ସାଦା ଓ କମଳେ ରାଜେ କିମ୍ବୁ ଜିନିସ ଥାକେ ଏବଂ ତାତେ ବେ ଆଲୋ ଓ ଛାଙ୍ଗ ପଢ଼େ ତା ବିଭିନ୍ନ ରୁହ ହେଉଥାଏ ତାରତମ୍ୟ ସଟି ବା ମାନ୍ୟମାନ ଆଲୋଛାମା ହେ । ଏତିଟି ରାଜେର ଆଲୋଛାମାର ଏ ତାରତମ୍ୟ ତାଲୋଭାବେ ଲକ୍ଷ କରେ ସଠିକତାବେ ଆକାଶ ହେ । ଶୂର୍ବେର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଛାମାର କିମ୍ବୁ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଦେଓଯା ଆହେ । ତାଲୋ କରେ ଲକ୍ଷ କରିଲେ ବିଦୟାଚି ବୁଝିଲେ ସହଜ ହେ ।

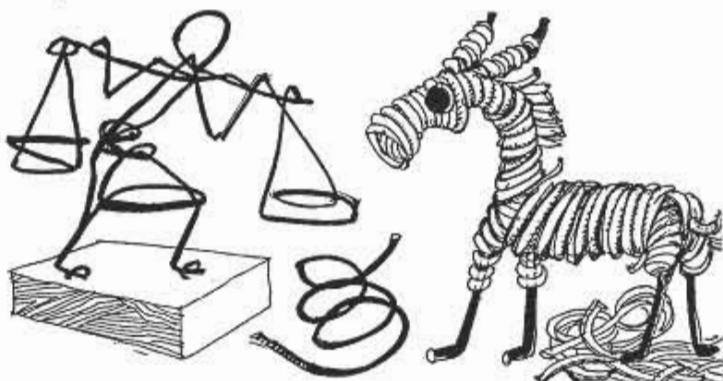
ରୁହ : ହରିତ ଥାଏ କଲାକାର ବୁଝାଇ ରୁହ । ବେ ବିବରେ ହବି ଆକାଶ ହେ ତାର ରୁହ ଖୁବ ତାଲୋଭାବେ ଲକ୍ଷ କରେ ତାରପର ଆକାଶ ହେ । ଲାଲ ରୁହ ଲାଲ ଲାଗିଯେ ଦିଲେଇ ହେ ନା । ଆଲୋଛାମାର ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶାଶାରେ ଅନ୍ୟମ୍ୟ ରାଜେର ଆଭାର ମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ରାଜେର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଟି । ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାରତମ୍ୟ ତାଲୋଭାବେ ବୁଝେ ନିରେ ଲାଲ ରୁହ ଲାଗିଲେ ହେ । ଆମରା କଥାର କଥାର ବଳି ଆମାଦେର ଅନ୍ତିମ ବା ପାହଣ୍ଡା ସବୁଛ, ଉଚ୍ଚକ ସବୁଛ, ହଳ୍ଦ ଆଭାସୁକୁ ସବୁଛ, ଶାଳ, ମୀଳ ମେଖାନୋ ସବୁଛ, ସବୁଜେର ମାଥେ ଆହେ ଆରା ନାନା ରକମ ରୁହ । ସୁତରାହ ପାଇଁ ଏକିକେ ସବୁଛ ଲାଗିଲେଇ ଠିକ ରୁହ କରା ହଲେ ନା । ବେ ଧରନେର ସବୁଛ ଦେଇ ସବୁଛଇ ଲାଗିଲେ ହେ । ତା ନା ହଲେ ହବି ଶାଖିଲ ଘନେ ହେ । ରାଜେର ବ୍ୟବହାର ସର୍କାରେ ସର୍କତନ ହକେ ହେ । ହବି ଆକାଶ ଅନ୍ୟ କେନ କେନ ରୁହ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ ତାର ପରିଚିତି ଆଗେଇ ଦେଇବା ହେବେ । ବେ ରୁହ ଦିଲେ ହବି ଆକାଶ ହେ ଲେ ରାଜେର ବ୍ୟବହାର-ନିଯମ କରେକମିନ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ରୁହ କରେ ନିତେ ହେ । ରାଜେର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନା ହଲେ ହବି ନକ୍ତ ହେଉଥାର ଅନେକ ସଞ୍ଚାକଳା ଥାକେ ।

ପାତ୍ର : ୬

କାପଡ଼, କାଳିଜେର ହବି ଏବଂ କାଠ ଓ ଫେଲନା ହିଲିସେର ଭାସ୍କର୍ତ୍ତର

ରୁହ-କୁଣି ଦିଲେ ହବି ନା ଝାଁକେଇ ହବି ତୈରି କରା ଯାଏ । ଯାଏ ରୁହ ଓ କୁଣି ଯୋଗାଇ କରିଲେ ପାଇଁ ମା-ଦୁଃଖ କରାଯାଇ କିମ୍ବୁ ଦେଇ ନା ।

ଏକ ରଜ୍ଜ କାଳିଜ-ହୁଲୁ, ମୀଳ, ଶାଳ, ସବୁଜ ଅନ୍ତିମ ରାଜେର କାଳିଜ ବାଜାରେ କିମ୍ବତେ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ । ଦେଲି-ଯିଦେଲି ଶୁମ୍ଭୋନେ ପରାପରିକା ଲାହାଇ କରି ମାଓ । ଏହି



ଶୋଭାର କାର ଓ ଏହି ଶୈତିରେ ଭାସ୍କର୍ତ୍ତର

ରାତିଲ କାଳଙ୍କ ପ୍ରୋଜନ । ତା ହଲେଇ ମେ
କେଟେ ଛବି ତୈରି କରାତେ ପାଇବେ ।
ଏକଇତାବେ ରାତିଲ ଟୁକରୀ କାଗଢ
ଦିଯେଓ ଛବି ତୈରି କରା ସମ୍ଭବ ।
ଟୁକରୀ କାଗଢ ମୋଟାଢ କରା ଯୋଟେଇ
କାଠିଲ ନଥ । ଦର୍ଜିର ପୋକାନେ ଖେଳେ ଥର୍ମ
କାଗଢ ସମ୍ଭବ କରାତେ ପାଇବେ ।

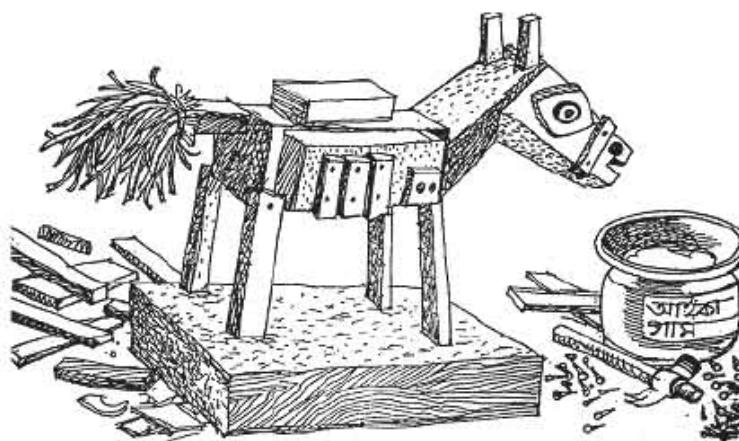
ଫେଲନା ଜିନିସ— କାଳଜ, କାଠ,
କାଗଢ, ଚିନାମାଟିର ଇଣ୍ଡିପାତିଲେର
ତାଙ୍ଗ ଟୁକରା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଯେ ଅନେକ
ପ୍ରକରେର ଛବି ଓ ତାଙ୍କର୍ମ କରା ଯାଇ ।

କାଳଙ୍କ କେଟେ ଛବି କର ବା ଟୁକରୀ କାଗଢ ଶିରେଇ ଛବି ବାଲାଓ—ଯେ ଛବି ବାଲାବେ ତା ପେନସିଲେ ହାଲକା ଖେଳି ଦିଯେ ମୋଟା
କାଗଜଟିତେ ଛାଇଁ କରେ ନିଲେ ଛବି ତୈରି କରାତେ ସ୍ମୃତିଧା ହର । କାଠ କାଗଢ ଓ କାଗଜ ମୋଟା ଛବିକେ ପ୍ରୋଜନମତୋ ରଂ ଦିଯେ
ଠିକେଓ ଛବି କରାତେ ପାଇ । ଅନେକ ବଢ଼ ବଢ଼ ଶିଳ୍ପୀ କାଳଜ, କାଗଢ ମୋଟା ଓ କିଛୁ ଏକେ ପରକମ ଛବି ତୈରି କରାଇଲେ । ଏ
ଧରନେର ଛବିକେ ବଳା ହର ‘କୋଲାଇ’ ଛବି ।



କୋଲାଇ ଛବି । କାଳଙ୍କ ହିଙ୍କୁ ଓ କେଟେ ଛବି ।

ଏତାବେ ରଂ-ବେଳାଜେ କାଗଢ ହିଙ୍କୁ ଓ କେଟେ କୋଲାଇ ଛବି କରା ହର ।



ଟୁକରା କାଠ ମୋଡ଼ା ଲାଗିଲେ ନାଲା ରକ୍ଷଯ ହୋଟିଥାଏଟୋ ତାଙ୍କର୍ମ ତୈରି କରା ଯାଇ ।

ଗାହର ଭାବ : ଏକଟ ତାଙ୍ଗଭାବେ କରାଲେ ନାଲା ଆକୃତିର ସାଥେ ମିଳ ଦୁଇ ପାତରୀ ଯାବେ । ମେଘୁଲୋକେ ଏକଟ କେଟେ ହେଟେ
ନିଲେଇ ହେଟ ତାଙ୍କର୍ମ ତୈରି ହରେ ପେଲ । ଏତାବେ ହେଟିବଢ ନୁଡ଼ି ପାତର ଦୁଇ ଏକ-ଆଧୁ ଏକେ ଏବଂ ଦୁ-ଚାଲାଟି ମୋଡ଼ା ଲାଗିଲେ
ତାଙ୍କର୍ମ କରା ଯାଇ । ଲୋହର ଭାବେ କାଗଢ ଶେଟିଲେ ଏବଂ ଏକଟ ମୋଟା ତାର ହାତ ଦିଯେ ବୀକିରେ ଅନେକ ରକ୍ଷଯ ତାଙ୍କର୍ମ କରା ଯାଇ ।

ପାଠ : ୭

ଛବି ଥିବାର ଉପକରଣ

ସାଧାରଣଭାବେ ଆକାଶ ଉପକରଣ—ପେନସିଲ, କାଳି, କଳମ, ଛଳରା, ପୋଟିର ରଂ, ପ୍ଲାସ୍ଟିକ, ରାଶପେନସିଲ, କାଠକରଳା, କେମଳ,
ଯାର୍କିର କଳମ, ବିଭିନ୍ନ ଭଳି, ଡେଲାର, କାଗଢ ଓ କ୍ୟାନତାନ । ଏ ଛାଡ଼ାଓ ଇଞ୍ଜେଲ, ଟେଲିଵିଜନ, ହାର୍ଡବୋର୍ଡ, ଟିପ, ଛୁରି, କୌଚି, କ୍ରେଡ,

আঁষ্টা, তিসির তেল, তারপিন তেল এমনি আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় ছবি আঁকার জন্য। সব উপকরণই একসাথে যোগাড় করার প্রয়োজন হয় না। যে মাধ্যমে ছবি আঁকা হবে সেই মাধ্যমেই উপকরণগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে। এখানে কয়েকটি মাধ্যমের বর্ণনা ও উপকরণের বিবরণ দেওয়া হলো।

কাগজ

এক সময় আমাদের দেশে ঢাকা শহর ও তার আশপাশে ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ হাতে তৈরি হতো। হাতে তৈরি কাগজকে ইংরেজিতে বলে ‘হ্যান্ডমেড’ পেপার। প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে এ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। তবে আমাদের আশপাশের অনেক দেশেই হ্যান্ডমেড কাগজ তৈরি হচ্ছে। যেমন-ভারত, নেপাল ও মিয়ানমারে। হ্যান্ডমেড কাগজ জলরঙে ছবি আঁকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাগজ। বাংলাদেশে ছবি আঁকার জন্য যে কাগজ সহজলভ্য তা হলো কার্টৃজ কাগজ। কার্টৃজ পাতলা ও মোটা দুই-তিন রকম হয়ে থাকে। বেশি মোটা ও খসখসে কার্টৃজে জলরঙে ছবি আঁকা যায়। বেশি মসৃণ কাগজে জলরং ছবি ভালো হয় না। ছবি আঁকার জন্য বিদেশের তৈরি অনেক রকম কাগজই পাওয়া যায়।

ছবি আঁকার বোর্ড, ক্লিপ ও ইঞ্জেল

ছবি আঁকার কাগজ রাখার জন্য প্লাইটেডের তৈরি বা হার্ডবোর্ডের তৈরি একটি বা দুটি বোর্ড প্রয়োজন। আমাদের দেশে হার্ডবোর্ড তৈরি হয় তাই এটি সহজলভ্য। প্রয়োজনমতো মাপের একটি হার্ডবোর্ডের টুকরা করাত দিয়ে কেটে তার কিনারা শিরীষ কাগজে ঘষে মসৃণ করে নিলে ছবি আঁকার বোর্ড তৈরি হয়ে গেল। সাধারণত বোর্ড ৪৫x৬০ সেমি. মাপের হলেই ভালো হয়। সম্ভব হলে বড় ছবি আঁকার জন্য আরও বড় বোর্ড তৈরি করে রাখতে পার। জলরং, পোস্টার রং, পেনসিল, কালি-কলম, ক্রেয়েন, প্যাস্টেল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় কাগজে এবং এই কাগজ বোর্ড ক্লিপ দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হয়। আটকানোর জন্য দুটো থেকে চারটি ক্লিপ অবশ্যই প্রয়োজন।

ইঞ্জেল

ইঞ্জেল হলো ছবি আঁকার স্ট্যান্ড। ছবি আঁকার বোর্ড ইঞ্জেলে রেখে ছবি আঁকতে হয়। জলরং, কালি-কলম, পেনসিল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকতে অনেক সময় টেবিলে রেখে, হাতে রেখে বা মেঝেতে রেখে ছবি আঁকা যায়। ইঞ্জেলের খুব প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তেলরঙে আঁকতে গেলে ইঞ্জেল অবশ্যই প্রয়োজন। ইঞ্জেল কাঠ এবং অ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে।

পাঠ : ৮, ৯, ১০

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

বিভিন্ন মাধ্যমেই আমরা ছবি আঁকতে পারি। যেমন-পেনসিল, প্যাস্টেল, কালি-কলম, জলরং, তেলরং, পোস্টার রং ইত্যাদি।

সাদা-কালো ছবি

পেনসিল : কাঠ পেনসিলের গায়ে লেখা থাকে- HB, 1B বা B, 2B, 3B, 4B, 6B। HB হলো মোটামুটি শক্ত শীষ পেনসিল। সাদা কাগজে হালকা ও শক্ত দাগ হয়। 2B-1B এর চেয়ে নরম ও দাগ কাটলে বেশি কালো হয়। এভাবে 3B আরও নরম এবং কালো। 4B-3B এর চেয়ে নরম ও কালো এবং 6B সবচেয়ে নরম ও কাগজে সবচেয়ে কালো গভীর দাগ কাটে। শুধু এই পেনসিলগুলো দিয়েই সাদা কাগজে সুন্দর সাদা-কালো ছবি হতে পারে। পেনসিলকে নানাদিক থেকে ঘষে বা ছোট রেখা ও লাইন টেনে আলোছায়ার অনেক রূপ ও পরিবর্তন ফুটিয়ে তোলা যায়।

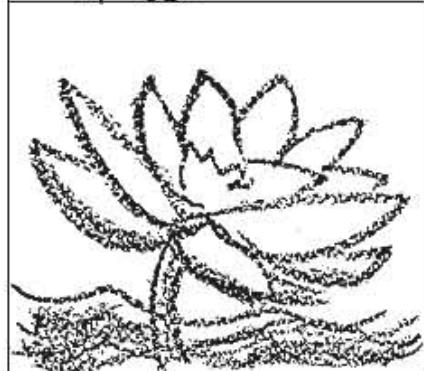
কালি-কলম : 'চাইনিজ ইঞ্জ' বলি আমরা একদম কালো কালিকে। সঙ্গত চীন মেশের লোকেরা এই কালি প্রথম ব্যবহার করে। প্রথম ব্যবহারের কথা সঠিকভাবে কোন না গেলেও চীন থাচিন ছবি থেকে শুরু করে বর্তমানকালের ছবি মেশের দুর্বা বায় কালো কালি ব্যবহারের প্রাথমিক ভাসের ছবিতে খুব বেশি। কালো কালি ও সাধারণ নিয়ের কলম দিয়ে সূন্দর ছবি আৰু ঘায়। তাই এই ছবি হয় সম্পূর্ণ রেখা-প্রধান। নিয়ের কলমের মতো ছাই-কলম বা ছাই-নিব কিনতে পাওয়া যায়। নিয়ের কলম বানিয়ে নিয়ে পায়। খালের সূন্দর কষি বা খালের সূন্দর গাছ কেটে তা দিয়ে সূন্দর কলম বানানো যায়। আমাদের মেশের বিখ্যাত পিণ্ডী অরণ্যে আবেদিন ঝৌর অনেক ছবি পাইকেছেন এই খালের কলম ও কালো কালি দিয়ে।

সাদা-কালো : সাদা-কালো ছবি আৰু ঘায় আজো বিষ্ণু মাধ্যমে। বেমন-কাঠকলমা (চারকোল), কেরল ও কালো রঞ্জের মার্কিং কলম। তোমাদের বাড়ির সাধারণ কাঠকলমা দিয়ে আৰু কাঠে ঢেক্টা কৰা যেতে পারে। তবে এ কাঠকলমা ছবি আৰু কল্প খুব উপযোগী নহ। ছবি আৰু কল্প এককাম নহয় ও সূন্দর কাঠি দিয়ে কলমা তৈরি হয়ে থাকে এগুলোকে চারকোল বলে। কালো, রং ও পেনসিলের দোকানে বৌজ করলে পেয়ে থাবে। কাঠকলমা দিয়েও কল্পে থাবে, কখনো কেবা টেসে ছবি তৈরি কৰা যেতে পারে। তবে কাঠকলমা বা চারকোল দিয়ে আৰু ছবিকে স্থানী কৰার জন্য এককাম কল্প পদাৰ্থ ছবিকে উপর দেখে কৱে দিলে কলমাৰ শুঁড়ো পড়ে থায় না। ফিক্যাটিভ (Fixative) নামে এই কল্প পদাৰ্থ রঞ্জের দোকানে বৌজ করলে পাওয়া যাবে। মোসের মতো কালো ও মেটে রঞ্জের এক ধৰণের ছেট কাঠিৰং পাওয়া যায়। তাকেই কেরল বলে। কেরল দিয়ে থবে ঘৰে সূন্দর সাদা-কালো ছবি আৰু ঘায়। মার্কিং কলম, কালোৱং ও অনেক রঞ্জের হয়ে থাকে। কালো ঘার্কিং কলম সিলসেচাৰ কলম দিয়ে রেখাৰ পৰি রেখা টেনে সাদা-কালো ছবি আৰু ঘায়।

অয়ত অনেক মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি তৈরি হতে পারে। বেমন-শুন্দু কালো রং দিয়ে, অয়ত মাধ্যমে এবং কালো ও সাদা পোস্টার রং দিয়ে।

ছবি আৰু কলম রং

বিভিন্ন রংকে ছবি আৰু ঘায়। ছবি আৰু ঘায় মাধ্যম রং সম্পর্কে প্ৰথমেই আমরা একটু জেনে নিই। হলুদ, শাল ও নীল এই তিনটিই হচ্ছে প্ৰাথমিক রং। হলুদ ও শাল যিশিয়ে হয় কলমা রং শাল ও নীল যিশিয়ে হয় বেলুনি, নীল ও হলুদ যিশিয়ে হয় সুন্দু। সুন্দুৰ কলমা, বেলুনি ও সুন্দুক রংকে কলকে পারি মাধ্যমিক রং। মাধ্যমিক রঞ্জের মতো প্ৰাথমিক রঞ্জের তিনটি রংকে পৱিয়াদেৰ ভায়ত্বয় ঘটিয়ে প্ৰয়োজনযোগ্য অস্থান্য রং তৈরি কৰা যায় যেমন— উজ্জ্বল সুন্দু রং পেতে হলে হলুদেৱ



উজ্জ্বল সুন্দুতে, ঘাৰে প্যান্সেটে বা কেন্দ্ৰে এবং
নিয়ে কালি-কলমে আৰু কিসটি ছবি।

তাগ বেশি এবং নীলের ভাগ কম মেশালে তা পাওয়া যাবে। খয়েরি রং তৈরি করার জন্যে লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রঙের তারতম্য ঘটিয়ে মেশাতে হবে। প্রাথমিক রং থেকে একদম কালো রং তৈরি করা সম্ভব না হলেও কাছাকাছি গাঢ় রং তৈরি করা যায়। তবে প্রাথমিক রং হলুদ, লাল ও নীল এই তিনটি রং দিয়ে মোটামুটি একটি রঙিন ছবি আঁকা সম্ভব।

জলরং : পানি মিশিয়ে যে রং দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং যে রং সচ্ছ তাকেই জলরং বলা হয়। পানি মিশিয়ে অস্বচ্ছ রং দিয়েও ছবি আঁকা হয় কিন্তু সেগুলোকে জলরং বলা হয় না। সচ্ছ রংকেই জলরং বলা হয়। সচ্ছ রং হলো একটি রং লাগাবার পর তার উপর আরেকটি রঙের প্রলেপ পড়লে নিচের রংটি হারিয়ে যায় না। আগের রং ও পরের রং দুটোরই অস্তিত্ব অনুভব পাওয়া যায়। বাস্তুর ভেতরে চারকোণা ‘কেক’ হিসেবেও পাওয়া যায়। ট্যাবলেট হিসেবেও এই রং তৈরি হয়ে থাকে। রঙের দোকানে যে পাউডার রং পাওয়া যায় তা পানি দিয়ে গুলিয়ে ছবি আঁকার জন্য জলরং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফটো রং করার জন্য একরকম রঙিন কাগজ পানি দিয়ে ভিজিয়ে জলরং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ রং কাচের শিশিতেও পাওয়া যায়। ড্রাই কালি হিসেবে বিভিন্ন রঙের কালি কাচের শিশিতে পাওয়া যায়। এ রং দিয়েও জলরঙের ছবি আঁকা যায়। দোকানে কাচের শিশিতে পোস্টার রং পাওয়া যায়। এ রং অবশ্য অস্বচ্ছ রং। তবে জলরঙের মতো করে ছবি আঁকার জন্য এ রং ব্যবহার করা যায়। জলরঙে সাধারণত সাদা রং ব্যবহার করা হয় না এবং তুলি ও রং নিয়ে কাগজে বেশি ঘষাঘষি করা যায় না। দুটি বা তিনটি প্রলেপে (ওয়াশে) ছবি আঁকতে পারলে ছবি সুন্দর হয়।

পোস্টার রং : পোস্টার রং অস্বচ্ছ জলরং। অস্বচ্ছ জলরং হলো একটি রঙের উপর অন্য রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রঙের মতোই আরেকটি মাধ্যম রয়েছে ‘টেক্সারা’ নামে। টেক্সারা রং ছবি আঁকার সময় বিভিন্ন রঙের সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে রংকে হালকা করা যায়। জলরঙের সাথে সাদা রং মেশালে রঙের স্বচ্ছতা থাকে না। পোস্টার ও টেক্সারা রং এক রং দিয়ে আরেক রংকে সহজেই ঢেকে দেওয়া যায়। যতবার রং দরকার লাগলে যায়।

পাউডার রং : পোস্টার রং অস্বচ্ছ জলরং। অস্বচ্ছ জলরং হলো একটি রঙের উপর অন্য রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রঙের মতোই আরেকটি মাধ্যম রয়েছে ‘টেক্সারা’ নামে। টেক্সারা রং ছবি আঁকার সময় বিভিন্ন রঙের সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে রংকে হালকা করা যায়। জলরঙের সাথে সাদা রং মেশালে রঙের স্বচ্ছতা থাকে না। পোস্টার ও টেক্সারা রং এক রং দিয়ে আরেক রংকে সহজেই ঢেকে দেওয়া যায়। যতবার রং দরকার লাগলে যায়।

জলরং, পোস্টার রং, টেক্সারা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো সাধারণত কাগজে আঁকতে হয় এবং এগুলোই কাগজে ছবি আঁকার প্রধান কয়েকটি মাধ্যম। আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে যেমন— রঙিন মার্কিং কলম, চক ও মোমপ্যাস্টেল, রঙিন পেনসিল ইত্যাদি।

রঙিন মার্কিং কলম : বিভিন্ন রঙের মোটা ও সরু মার্কিং কলম পাওয়া যায় ছবি আঁকার জন্য। এগুলো কাগজে ঘষে লাইন টেনে সুন্দর রঙিন ছবি তৈরি করা সম্ভব। প্যাস্টেলে ছবি আঁকার কাগজ একটু খসখসে হলে ভালো হয়।

তেলরং : তেলরং সাধারণত টিউবে বা কোটায় নরম পেস্টের আকারে পাওয়া যায়। তিসি তেল ও তারপিন মিশিয়ে এ রং ব্যবহার করতে হয়। এ রঙে ছবি সাধারণত ক্যানভাসে, হার্ডবোর্ডে, কাঠে আঁকা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ ধরনের কাগজেও আঁকা যায়। ছবি আঁকার ক্যানভাস হলো একটু মোটা সুতায় ঘন বুননের কাপড়। রঙের দোকানে রঙিন অজ্ঞাইত পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। তার সাথে তিসি তেল ও তারপিন মিশিয়ে তেলরং তৈরি করা যায়। তেলরঙের ছবি দীর্ঘদিন স্থায়ি হয়। যুগ যুগ ধরে এ মাধ্যমের ছবি টিকিয়ে রাখা যায়। দেশ বিদেশের গ্যালারিতে (চিত্রশালা) কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ছবি এখনো অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে কয়টি আকৃতিতে ফেলা যায়?

ক. একটি	খ. দুইটি
গ. তিনটি	ঘ. চারটি

- ২। আলো-ছায়াকে মোটামুটি কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. একভাগে	খ. দুইভাগে
গ. তিনভাগে	ঘ. চারভাগে

- ৩। কেলাজ ছবি কীভাবে তৈরি করা যায়?

ক. কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে	খ. কাঠ কেটে
গ. কাঠ খোদাই করে	ঘ. কাগজে রং লাগিয়ে

- ৪। ইঞ্জেল হলো—

ক. ছবি আঁকার বোর্ড	খ. রং করার প্লেট
গ. ছবি আঁকার স্ট্যান্ড	ঘ. ছবির ফ্রেম

- ৫। সঞ্চাম ছবিটি কোন শিল্পীর আঁকা?

ক. কামরুল হাসান	খ. এস. এম সুলতান
গ. জয়নুল আবেদিন	ঘ. হাশেম খান।

ব্যবহারিক

- ১। রঙিন টুকরা কাপড় জোড়া লাগিয়ে কেটে-ছেঁটে একটি চিত্র তৈরি কর।
- ২। রঙিন কাগজ কেটে তোমার ইচ্ছেমতো ছবি বানাও। মাপ- 15×20 ইঞ্চি।
- ৩। ছেঁট বড় কাঠের টুকরা দিয়ে একটির সাথে আরেকটি লাগিয়ে তোমার ইচ্ছেমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি কর।
- ৪। লোহার তার বাঁকিয়ে জোড়া দিয়ে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ের রূপ ফুটিয়ে তোল :

ঘোড়া, হরিণ, মানুষ।
- ৫। লোহার তারে বা বাঁশের চটায় খড় পেঁচিয়ে একটি ঘোড়া বানাও।
- ৬। নুড়ি পাথর দিয়ে তোমার পছন্দমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি কর।
- ৭। যে কোনো দু-তিনটি খেলনা জিনিসের সমন্বয়ে তোমার ইচ্ছেমতো ছোটখাটো ভাস্কর্য তৈরি কর। সময়-৩ দিন।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবহারিক শিল্পকলা

পাতা : ১,২ ও ৩

বর্ণমালা ও হাতের লেখা (Typography & Calligraphy)

বালা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সাধারণ বর্ণমালার চেহারার সাথে আমাদের সরকারী পরিচয় আছে। অনেক দিন আগে বর্ণন সিমার টাইপ ব্যবহার হতো সরকার চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল। বেসন- বালা হরফে- বিদ্যুৎসাধা, ঝোমান, সুরুপা, ধীর্ঘি, সুলী, আধুনিক ইত্যাদি। ইংরেজিতেও হিল টাইপস, ঝোমান, ইউনিভার্স অভূতি। বালা হরফে সিমার আগে ব্যবহৃত হতো কাঠের টাইপ। গকালম কর্মকর্তা হিলেন এই কাঠের টাইপের আবিষ্কারক।



* * * * *
 MOBARAK
 * * * * *
 ঐদে মৌবারক

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ধাপে ধাপে উন্নতির কারণে বর্তমানে সিমার টাইপের ব্যবহার ও লেটার প্রেসের মূল্য ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। মুক্ত আমুগা সর্বল করে নিছে- অফসেট মূল্য, কন্ট্রাটাইপ ও অলিপ্টিক্যাল। কলে টাইপের চেহারার পরিবর্তন ঘটে হ্রত। অবৃক্তি ও অলিপ্টিক্যালের কারণে হরফের চেহারা, আকার-আকৃতি এক মুক্তই পরিবর্তন হয়েকলা কেন মূল চেহারাটা তৈরি করে নিছে পিছিয়াই। সেই আলিপ্টিক্যাল-অক্টের হরফের আমল থেকে বর্তমান অলিপ্টিক্যাল মূল পর্যবেক্ষণের মূল চেহারাটা পিছিয়ে দারাই সম্ভব হচ্ছে।

হরফের শিল্পূণ ইতি করতে হয়। এর অন্য প্রয়োজন কিছুদিন পিলাখিৎ অসূচীলন করা। কিছু আলো ও সেখতে সূচন হরফের হ্রত অসূচন করে যেতে হবে। কানাপুর মিজোর আক্ষা ও টাঙ্কাবী শক্তি দিয়ে হরফকে আরও করুণকর সম্মুখ সম্মুখ

পর্যন্ত শেষ হও
 আমে এই দিন
 ধারণার মধ্যে নাই
 অভ্যর্থনা।
 হয় উৎসবের এই সাজ
 দৃশ্য হয়ে উঠে যেই আজ
 যাতের হৃদয় যাত
 হোন, পুরুষ ভীরু শুধা
 এব্যাপ্ত হৃষ্যের পিণ্ডা
 বাঢ়ে ওঠে তথা
 অমর গানের মুঝে
 এব্যাপ্ত ফেরহারী
 অমি তি ভুলিণ্ড পাতি!
 পাহে না ভুলিণ্ড পেই
 তেই ভুলিণ্ডে তেনপিণ্ড
 তিষ্য ভুলিণ্ড এই দিনে
 রঙ যাও যাও হয়ে অমোকে পলাশে
 সুফিয়া বায়ান

চেহারা দেয়া যাব তা নিজেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হব। আগেই বলেছি হস্তের ষষ্ঠ রকম চেহারা ও শিল্প তা শিখোরাই করেছেন। হস্তের কিছু নমুনা, ছবি ও নিয়ম সংগ্রহ করে তা দেখে কিছুটিন নিয়মিত অনুশীলন করে পেলে-সুন্দর বক্তব্য বালা, ইত্তেজি সেখাম ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় সেখার বা হস্তের শিল্প সিংড়ে পারদর্শী হতে পারবে।

মোদের গবেষণার মোদের আশা আমরি বাংলাভাষা

- অতুল অসাদ সেন



মে সবে বংশৈত জীন্ম শুন্মে বঙ্গবানী।
সে সব কথার জন্ম নিন্ম ন জীনি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন তুম্হাম্ ॥
নিজ দেশ ভাগী কেন বিদেশ ন যান্তি ॥
মাতা পিতামহ একমে বংশৈত বশিতি ।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত আতি ॥

- আবদুল হাকিম

প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, হোল্ডিং
এ সুন্দর লেখার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞাপনের
জন্য টেলিভিশনের প্রচারে, সিনেমার জন্য
নানারকম নকশার, লেখার প্রয়োজন। বই
পুস্তকের প্রচ্ছদে, খবরের কাগজে,
সাইনবোর্ডে, নাম ফলকে এমনকি
রাজনৈতিক প্রচারের জন্য দেয়ালে লেখার
প্রয়োজনে হরফের নানারকম শিল্পরূপ দেয়া
হচ্ছে। বাণিজ্যিক শিল্পদ্রব্য যেমন উষ্ণথের
লেবেল, মোড়ক বা প্যাকেট, দুধ, বিস্কুট
ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, প্রসাধন
দ্রব্য-সাবান, তেল, লোশন ইত্যাদির
প্যাকেট এমনি হাজারো কাজে সুন্দর
টাইপোগ্রাফি বা লেখাঙ্কন অতি আবশ্যিকীয়
একটি শিল্পকর্ম।

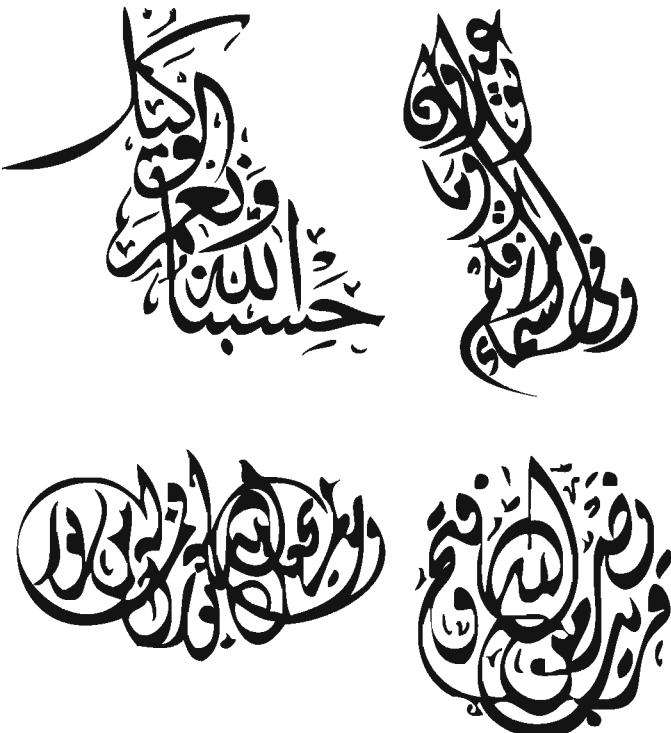
হস্তলিপি বা হাতের লেখাও একটি
শিল্পকর্ম। মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কারের আগে
যাবতীয় লেখালেখির কাজ হাতের লেখা দিয়েই হতো। রাজা বাদশার ফরমান জারি-দলিল দস্তাবেজ, শুঁথি লেখা, বই
লেখা, ধর্মগ্রন্থ লেখা সবই হস্তলেখা বিশারদদের দ্বারা হতো।

বাংলা হস্তলিপির পুরোনো পাঞ্চলিপি। তাল পাতার শুঁথি, দলিল দস্তাবেজের নির্দর্শন আমাদের জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে
রয়েছে। সুন্দর আরবিলিপিতে আছে কুরআন শরীফ। সারা পৃথিবীতেই সুন্দর আরবি হস্তলিপিতে অনেক কুরআন শরীফ
রয়েছে। আরবি হস্তলিপিতে ইসলামের অনেক মর্মবাণী বিশেষ চিত্রকলা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। যাকে বলা হয়
ক্যালিগ্রাফিচিত্র এবং যা ইসলামিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যময় দিক। যারা হাতের লেখায় পারদর্শী তাদের বলা হয়
ক্যালিগ্রাফার। আরবি, ফারসি, উর্দু এসব ভাষায় অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে সুন্দর ছবি করেছেন মুঢ়ল ও
পারশিক চিত্রকলায়।

ক্যালিগ্রাফি করতে যেযে অনেক শিল্পী লেখাকে বিভিন্ন জীবজন্ম, পাথি, গাছ এসবের অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাথরের
গায়ে খোদাই করা বেশ কিছু আরবি ক্যালিগ্রাফির নির্দর্শন জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। বাংলাদেশের পুরোনো কিছু
মসজিদের গায়েও ইসলামি শিল্পকলার সুন্দর নির্দর্শন হিসেবে এই ক্যালিগ্রাফি রয়েছে।

হাতের লেখার বা ক্যালিগ্রাফির পুরুত্ব এখনো রয়েছে। যেমন অনেক দলিল দস্তাবেজ হাতে লেখা হয়। কাউকে শুন্দা
জানাতে মানপত্রাটি সুন্দর হাতের লেখায় তৈরি করার রেওয়াজ এখনো আছে। বিয়ে, জন্মদিন ও আনন্দ অনুষ্ঠানের
আমত্রণগলিপি হাতে লিখে দেওয়ার নিয়ম সামাজিকভাবে একটা নাম্পনিক সংস্কৃতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা খুব সুন্দর। কবিতা লিখতে গিয়ে কবিতার লাইনে কাটাকুটি করে হাতের লেখা
ও কাটাকুটির রেখা মিশিয়ে তিনি ছবির রূপ দিয়েছেন। কবি নজরুলের হাতের লেখাও সুন্দর। অনেকেই তাঁদের হাতের



কয়েকটি ইসলামি ক্যালিগ্রাফি

সেখা অনুকরণ করে নিজের হাতের লেখাকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর হাতের সেখা অনুকরণযোগ্য। শিল্পী কামরুল হাসান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের সেখা সবার কাছেই পরিচিত। বাংলাদেশের সর্বিধান গ্রন্থে প্রেসের টাইপ ব্যবহার না করে পুরো গ্রন্থটি হাতে সেখা হয়েছে। লিপিকার হলেন শিল্পী আবদুর রউফ। সর্বিধান গ্রন্থটি ক্যালিগ্রাফি, অন্যান্য নকশা ও চিত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শৈলিক গ্রন্থ। হাতের সেখা সুন্দর করার কিছু নিয়ম এবং ক্যালিগ্রাফির কিছু নির্দর্শন এখানে ছাপা হলো। ভালো করে সক্ষ করলে এবং নিয়মিত অভ্যাস করলে তোমরাও ভালো হস্তলিপি বিশারদ বা ক্যালিগ্রাফার হতে পারবে।

পাঠ : ৪, ৫ ও ৬

নকশা (Design)

নকশা বা ডিজাইনের প্রয়োজন ও ব্যবহার মানব জীবনের সর্বত্র। অবশ্য ‘নকশা’ শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত। আমরা এখানে কিছু সাধারণ আকার-আকৃতি, ফুল, পাতা, পাখি, মাছ ও রেখা মিলিয়ে কাগজে নকশা তৈরির কথা আলোচনা করব যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে জীবনযাপনের প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের লোকশিল্পে নকশার ছড়াছড়ি। নকশিকাথা, পাখা, জায়নামাজ, তাঁতে তৈরি শাঢ়ি-বিশেষ করে জামদানি, টাঙ্গাইল শাঢ়ি, ঢাকাই বিটি শাঢ়ি, কাতান, বেনারসি ইত্যাদিতে হাজার হাজার নকশার ব্যবহার হয়েছে নানা রঙে। এসব নকশা আঁকার পদ্ধতি ও ব্যবহার ভালোভাবে লক্ষ কর। কাঠের কাঞ্জে- দরজায়, খাট-পালং তৈরিতে, বাজ্জে সিন্দুকে, বিভিন্ন আসবাবপত্রে, পাক্কিতে, লৌকায়, কাঠ খোদাই করে উচু উচু করে নানারকম নকশার কাজ আছে বাংলাদেশে। যেগুলোকে রিলিফ শিল্পকর্ম বলে। পোড়ামাটির ফলকেও এ ধরনের রিলিফ শিল্পকর্ম করা হয়। যার কথা মাটির শিল্পকর্ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এসব শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগ সহকারে দেখ- অনেক নকশার সাথে তোমাদের পরিচয় হবে।

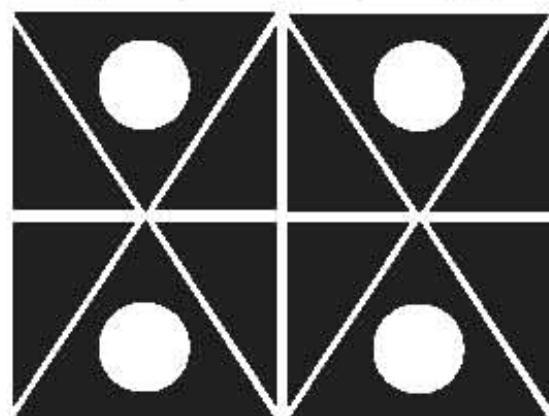
কাঠের পুতুল, হাতি, ঘোড়া, মাটির পুতুল, ইঁড়ি-কলসি, শখের ইঁড়ি, কাসা পিতলের তৈজসপত্র, সিলমসি, ফুলদানি, গোলাপজলদানি, সুরমাদানি, সিদুরপাত্র, অলঙ্কার রাখার পাত্র, সোনা-রূপার অলঙ্কার-এমনি সব ব্যবহারিক দ্রব্যে ডিজাইন ও নকশার ছড়াছড়ি দেখতে পাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে রাস্তায় ‘আলপনা’ আঁকা ভাষাশহিদদের প্রতি শুন্দা জ্ঞাপনের একটি বিষয়। আজকাল যে কোনো বিয়েতে, জন্মদিনে, দুদে, পূজায় ও প্রায় সব আনন্দ অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হয় যা বাংলাদেশের লোকশিল্পের সুন্দর নির্দর্শন এবং ফুল, পাতা, গাছ, পাখি ও রেখার মিলিত নকশার রূপ।

বৃন্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও রেখা এই চারটি উপাদান নকশা তৈরির প্রধান অবলম্বন। এই চারটি উপাদানকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে তুমি অনেক রকম নকশা তৈরি করতে পার। ছবির নকশাগুলো ভালোভাবে লক্ষ কর একই উপাদান ও রেখা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, নানা ভঙ্গিতে বসিয়ে নকশায় ছব্দ ও সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল ঘটিয়ে কবিতা ও গানে আমরা যেমন ছব্দ ও সুরের সৃষ্টি করে মনকে আন্দোলিত করি তেমনি নকশা বা ডিজাইনে বিভিন্ন উপাদান পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে চোখের দেখায় শুধু সুন্দর রূপ নয় একটা ছব্দ ও সুর সৃষ্টি হয়ে যায় হৃদয়ে।

সূত, তিহু, চতুর্ভুজ ও গোখা এই চারটি উপাদান ইসলামিক শিল্পকলাজগত শৈলী উপাদান। ইসলামিক শিল্পকলার শৈলীবজ্রজন ব্যবহার সাধারণত করা হয়ে আসে। ইসলামিক প্যাটার্নগুলোই শাখান্ত পেরেছে।

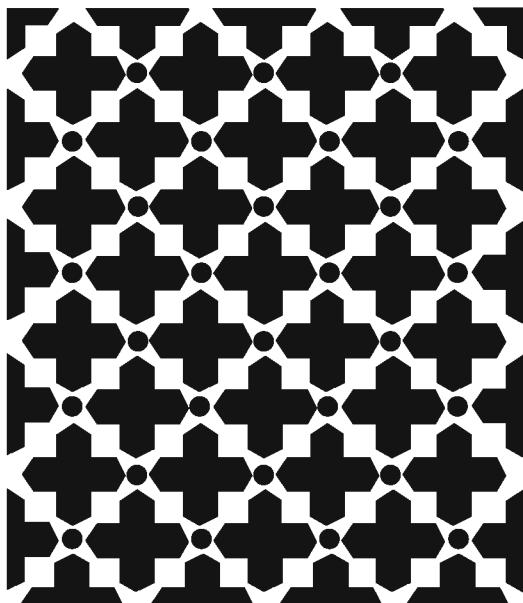
শালাসেশে ইসলামি আশেপাশের নিচৰ্মস বিভিন্ন মডেল ও ইসলামগুলো তৈরিকে উপরোক্ত ইসলামিক প্যাটার্নগুলোকে নামাজাবে ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে নকশার কাজ করা হয়েছে।



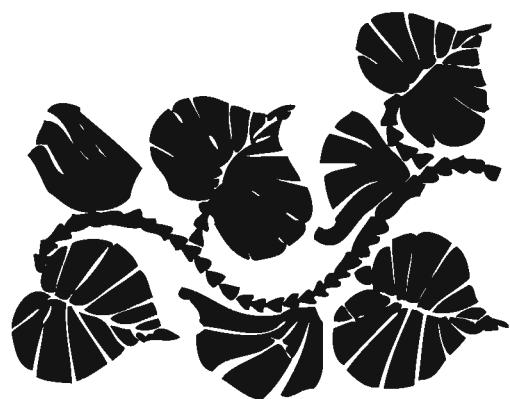
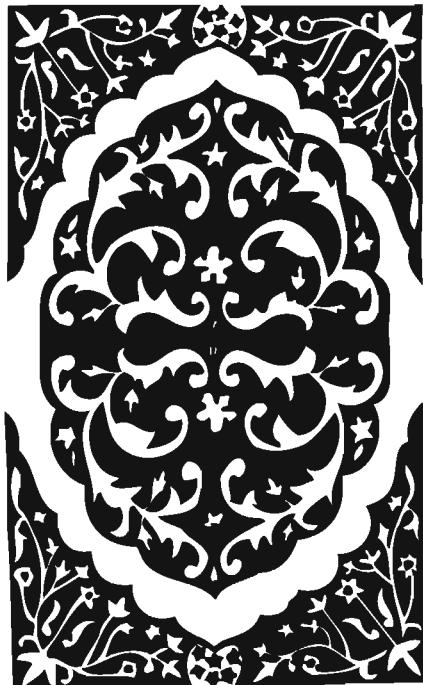
ইসলামিক প্যাটার্ন সকলা, বিভিন্ন কাজে এই
সকলা ব্যবহার করা যেতে পারে



বিন শরদের তিনটি আলগা

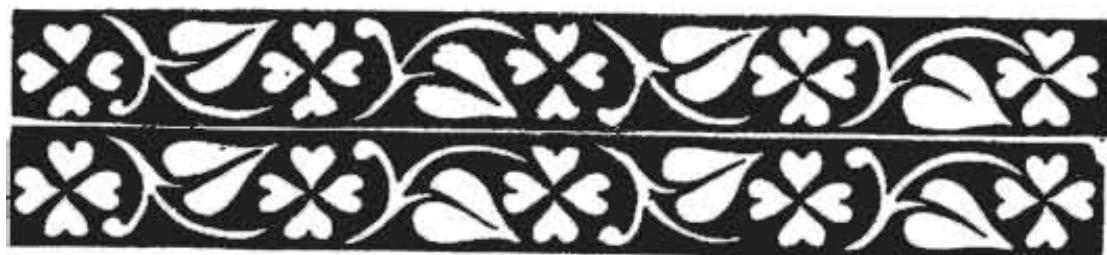
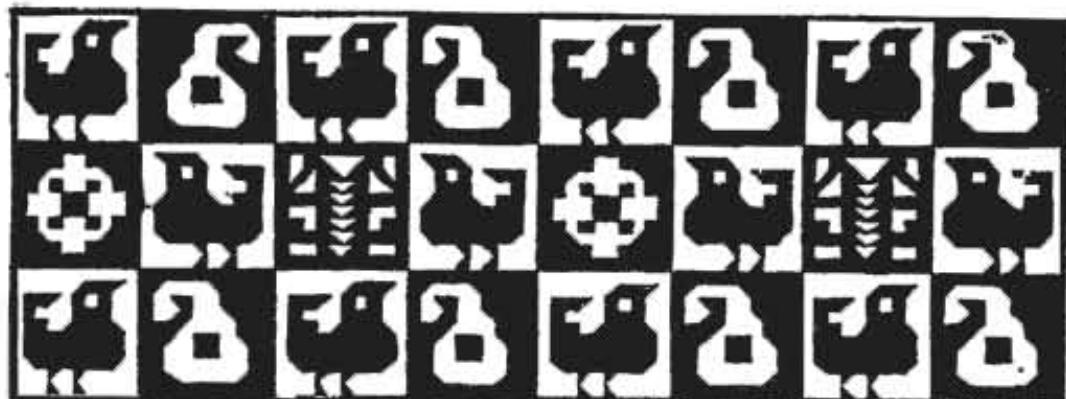


জ্যামিতিক প্যাটার্নে একটি ইসলামিক নকশা।



ফুল ও লতাগাতা দিয়ে দৃটি নকশা।

ফুল, লতাগাতা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে ব্যবহার
করে অনেক রকম নকশা করা যায় এবং তা বিভিন্ন
কাজে ব্যবহার করা যায়।



পাথি, কুল ও সতোগাতার মুটি নকশা

এখানে জ্যোতিক প্যাটার্নগুলোর সামূহিক ব্যবহার দেখানো হচ্ছে। তোমরা এতাবে ঢেক্টা কর—সেখ কর ইকম সকলা তৈরি করতে পার। উপরের কুল, পাথি, যাল, পাথি নিয়ে সকলা করার শিরময়গুলো দেখে অভ্যাস কর। সুন্দর ও সুন্দর সকলা তোমরাও তৈরি করে নিয়েসের কাজে ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পার। বেদন—কাপড় খালান, আলগনা ধীকার, বই পৃষ্ঠাকের প্রচ্ছন্দ, পোস্টার, সেরাল পত্রিকার, আমৰণপলিপিতে, ইমের্ক ও বিভিন্ন কাজগুলো।

পাত : ১, ৮ ও ৯

গোকীক ডিজাইন (Graphic Design)

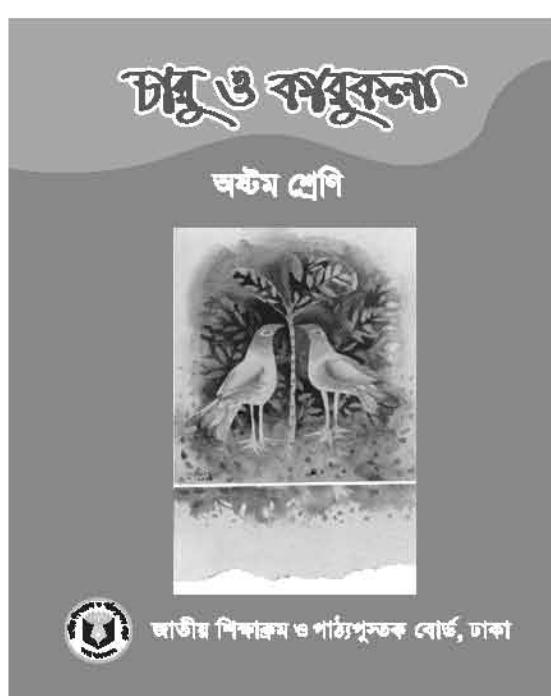
ছাগা বা ফুকানোর জন্য বে ডিজাইন বা নকশা করা হয় আকেই আমরা গোকীক ডিজাইন করতে পারি। সামা বিশেষ ফুকানোর জন্য এই গোকীক ডিজাইনের আভাসূচৰ। বই—পৃষ্ঠক ও ম্যাগাজিনের জৰাসজা, প্রচ্ছন্দ, কালেক্টোর, বিভিন্ন গোকের প্যাটের ডিজাইন থেকে শুরু করে ছাপাখানা থেকে মুক্তি বিভিন্ন প্রচারণামূলক প্রেসের, অন্যান্য বিবরণের জন্য নকশা, ছবি ও সাময়িকভাবে মুক্তি বিবরণের আকৃতিক ও সৌন্দর্য নির্ভর করে মুক্ত এই গোকীক ডিজাইনের উপর। সুক্রার গোকীক ডিজাইন অভ্যন্তর পুরুষপুরী একটি বিষয়।

কলাইটাইল আবিষ্কার বা এর ব্যাপক প্রচলন এর পূর্বে একজন গোকীক ডিজাইনার হাতের জন্য প্রস্তুতকৃত উপাদানের প্রাপ্ত সর্বানুসৃত হাতে তৈরি করতেন। ছবি, নকশা ও সেবার শৈলী বা স্টাইল সবই রং, কলি, ঘুলি, বিভিন্ন একজন কলম ইত্যাদি নিয়ে অভ্যন্তর করা হতো। এছাড়াও এয়ার ব্রাশ, স্কেল, কল্পাস ইত্যাদিত নকশার জন্য ব্যবহার করা হতো।

টাইপোগ্রাফির ব্যবহার গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টাইপোগ্রাফি হচ্ছে প্রচ্ছদ, ক্যালেভার, পণ্ডের মোড়ক বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ছাপার অক্ষর বা হরফ এর স্টাইল। বিভিন্ন স্টাইলের লেখা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য প্রয়োজন পোস্টার রং, চাইনিজ ইঙ্ক, বিভিন্ন মাপের তুলি, কম্পাস, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি। এখন কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসেছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। কম্পিউটার গ্রাফিকস এখন একটি বহুল পরিচিত শব্দ।



শিল্পী সন্ধীব দাস অস্থুর আঁকা একটি পোস্টার



শিল্পী হাশেম খানের ছবি দিয়ে করা একটি বইয়ের প্রচ্ছদ

কম্পিউটার গ্রাফিক শেখার জন্য আজকাল বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ছাপার জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় মকশা এখন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বিশেব সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদন করে থাকেন। এর ফলে মুদ্রণ এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সারা বিশ্বের মূদ্রণশিল্প এখন বলা যাব উল্লতির চরম শিখায়ে বিরাজ করছে। তাই ছাপা সজ্ঞাত বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পীর উপর সময় দেশের মুদ্রণ শিল্পের ভবিষ্যত নির্ভর করে। সুতরাং একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে আজনির্ভরশীল করা সত্ত্ব।

পাঠ : ১০, ১১ ও ১২

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

চলতি প্রথা, গ্রামীণ বা স্টাইলকে ফ্যাশন বলা হয়। এটি হতে পারে পোশাক, আসবাব অথবা গয়নাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র। এমনকি হেয়ার স্টাইলও এর বাইরে নয়। তবে Fashion (ফ্যাশন) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয় পোশাকের ক্ষেত্রে। আর ফ্যাশন ডিজাইন কল্পনাও আমরা বুঝি কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পোশাকের জনপ্রিয় আকার-আকৃতি ও অস্তুতপ্রশংসন।

ফ্যাশন পদ্ধতির আতিথানিক অর্থ প্রচলিত গীতি। সময়ের সাথে সাথে এ গীতির পরিবর্তন হয়। তাই একে আমরা সময়োপযোগী গীতির কলতে পারি। সত্যজীব সাথে ক্ষমতাবাল সহস্রক্ষিয় পরিবর্তন ঘটেছে মুগে যুগে। পরিবর্তন, পরিবর্দন, পরিমার্জন, কথনো বা সহযোগিন-বিবোজন সিংহে ফ্যাশন চলে এসেছে সময়ের সাথে সাথে।



একটি টি-শার্ট এবং একটি সালোকাজ-কামিজের নমুনা

বেদন— কখনো হয়েতো তিলেচালা পোশাক প্রয়োজন হলে করে, কখন সবাই এই স্বরক্ষ পোশাক পাই এবং এটাই কখনকার ফ্যাশন। আবার কখনো বাঁটুটো পোশাক অসমিয় হয়। সুতরাং ভট্টাই সে সময়ের ফ্যাশন। এ অস্য ফ্যাশন সীরিজের মত।

বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই ফ্যাশন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বা সর্বাদা প্রকল্প করে। উনিশ ও বিশ শতকে ফ্যাশনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ফ্যাশন হাউস ও ফ্যাশন ম্যাগাজিনের জন্মযোগ্য কর্মসূল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ মানুষের জীবনব্যাপ্তির মান বেড়েছে। আর তার সাথে পাঞ্চ দিনে বেড়েছে মানুষের ফ্যাশন সচেতনতা।

পাচাশে ও আমেরিকাতে ফ্যাশনেবল পোশাক রূপালী ক্ষেত্রে বাহামেশ্বণ আর তার অর্থনৈতিক ভিত্তিক মজবূত ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের গার্ডেনস ইভেনিংগুলো পোশাক ও পোশাকের ফ্যাশনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই পোশাক প্রস্তুতকর্ত্তা গার্ডেনসগুলোর সংক্ষিপ্ত BGMEA নির্জেরাই একটি ফ্যাশন ডিজাইন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান পঢ়ে উঠেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর গীতিমতো ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে। পোশাক এ একটা শিল্প, একটা আর আর কল্পনা অঙ্গের রাখে না। প্রেমি, সেপা, বাস, সামাজিক অকর্তৃতাবেদে সবার কাছেই ফ্যাশনেবল পোশাক এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাজেই একে এখন আর কেবল শব্দ বলা বাবে না। বরং পোশাকের সাথে বিলিয়ে ভূতা, স্যার্কেল, হাট, ইঞ্জি, পরনা, ছাতা সবাই এখন হওয়া চাই ফ্যাশনেবল।

কবে ফ্যাশন অবশ্যই হতে হবে নিজ নিজ সমাজ, সহস্রতি, আবহাও ও আরামের সাথে সামঝস্যপূর্ণ। বাকাদেশে এখন প্রচুর ফ্যাশন হাউস হচ্ছে। আর সিভাসভূম ডিজাইনের পোশাকের সমাহারণও বাজারে দক্ষ করা বাবে। তাই

ফ্যাশন ডিজাইনারের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। শিরুচি, সঠিকভাবে রঙের সমন্বয়বোধ ও স্টাইলিশ পোশাক সম্পর্কে ধারণা এই পোশাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

এর সাথে সম্মত আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবহান বাহ্লার লোকায়ত ধারা, আমাদের ঝুচি, মূল্যবোধ স্বকীয়তা ইত্যাদি। প্রতিটি জাতির একটা নিজস্ব ধারা বা ঐতিহ্য আছে। আর এই ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছন্দ ইত্যাদিতে।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি নির্তর গ্রোবাল ভিলেজে এখন আমরা বিশ্ব সংস্কৃতির প্রবাহে আপন সংস্কৃতিকেও তুলে ধরেছি। নিজ সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষণ্ম রেখে কখনো বা পাঞ্চাত্যের ধারার সহিতশৈলে আমরাও সময়কে ধারণ করেছি বিশ্বায়নের সাথে। এর প্রভাবে আমাদের পোশাকশিল্পেও ঘটেছে ভিন্নমাত্রা। বৈচিত্র্যতা এসেছে তার ডিজাইনে। আমাদের দেশের অনেক ডিজাইনারদের পোশাক বিশ্ববাজারে সমাদৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত তারকা মডেল বিবি রাসেলের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি।

দেশীয় তাঁতশিল্পকে উজ্জীবিত করে তাঁতের বোনা কাপড়ে আধুনিক ফ্যাশনে তিনি পোশাক তৈরি করে একদিকে যেমন দেশীয় তাঁতের পুনর্জীবন দিয়েছেন, তেমনি দেশের নতুন প্রজন্মকে উদ্বৃদ্ধ করেছেন এই শিল্পে তাদের মেধা মনন প্রয়োগ করে একটা নতুন ধারার উন্নয়ন ঘটাতে।

বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবময় উৎসব পহেলা বৈশাখ। ফ্যাশন হাউসগুলো ক্ষেত্রাদের আঁচহের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতিবছর বৈশাখ বরশের জন্য তৈরি করে আবহাওয়া উপযোগী আরামদায়ক সুতিপোশাক। পোশাকে বর্ণীল হয়ে উঠতে চায় সব বাঙালি।

আবার ২৬শে মার্চ উপলক্ষে লাল-সবুজের বিশেষ আয়োজনে মেয়েদের জন্য টপস, সালোয়ার-কামিজ, ছেলে-মেয়েদের ফতুয়া ও ছেলেদের নানা ডিজাইনের পাঞ্জাবি তৈরি করে। মহান ভাষার মাসে আমাদের ভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করে আমাদের প্রিয় বর্ণমালা দিয়ে ছোট-বড় সবার জন্য নানারকমের বৃচ্ছীল পোশাক তৈরি করে। আবার প্রকৃতিতে যখন ফাগুনের আগমন ঘটে তখন তাকে বরণ করতে ফ্যাশন হাউসগুলো বাহারি পোশাকে আমাদের মনও রাঙিয়ে তোলে।

আমাদের জাতীয় দিনসমূহ, ধর্মীয় উৎসবে অথবা বাঙালির ঐতিহ্যময় দিনগুলোতে নিত্যনতুন রং-বেরং এর নতুন নতুন ডিজাইনে পোশাকশিল্পে একটা আধুনিক ধারা তৈরি হয়েছে। এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একজন চারু ও কারুশিল্পীর বিশাল ভূমিকা থাকে। কারণ তোমরা ইতিমধ্যে যে সকল নকশা বা ডিজাইন শিখেছ তার বহুমাত্রক প্রয়োগ ও পোশাকের ডিজাইন এর সমন্বয় করে তুমিও হয়ে উঠতে পার একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনার।

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

আধুনিককালে আবাসগৃহ বা অফিস কক্ষের তিতরে প্রয়োজন ও ঝুচি অনুযায়ী যে সাজসজ্জা করা হয় তাকে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন বা অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বলা হয়। সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ যেমন প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ দেখে দেখে বিমোহিত হয়েছে, তেমনি ঐ সৌন্দর্যের ছোঁয়া তার অভ্যন্তরীণ জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে অনেক পূর্ব থেকে। এটি যেমন তার সুরক্ষিত পরিচয় বহন করে তেমনি পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পরিবেশে সে জীবনযাপনে একধরনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। চারু ও কারুকলা বিষয়টি এ বিষয়ে অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। আজকাল আবাসিক বাসা, অফিস, অডিটরিয়াম, ফর্মা-৯, চারু ও কারুকলা-৯ম-১০ম

বড় বড় স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান, নানা প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, হোটেল, মোটেল, রেস্টহাউস নানা ক্যাশন হাউস থেকে শুরু করে অনেক জায়গাই অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে এর ভেতরে একটা নামনিক আবহ তৈরি করা হয়, যা দেখে আমাদের মনপ্রাণ, চোখ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর পরিবেশে কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, মনেও আনন্দ থাকে।



একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার নমুনা

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা সাধারণত বাড়ি বা অফিস কক্ষের ব্যবহারকারীর বিবিধ প্রয়োজন, তার বুচি, সংস্কৃতি ও আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য ঝোঁকে করা হয়। অলংকরণ বা সাজসজ্জা শুধু কক্ষসমূহের দেয়াল, মেঝে বা ছাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তবন বা কক্ষে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক আলো আসবাবপত্র ইত্যাদিও সাজসজ্জার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘরে কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় এ বিষয়টির উপরও সাজসজ্জার স্বার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করে। অতিরিক্ত জিনিসপত্র থাকলে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সুতরাং আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে প্রয়োজনের গুরুত্বকে মাথায় রেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়াও দেয়ালের রং এবং মেঝের টাইলস বা কার্পেটের রংও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য রেখা, ফর্ম, আলো এবং রঞ্জের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। রঞ্জের ব্যবহারের ভারতমেয়ের কারণে ছোট কক্ষকেও অশেকাকৃত বড় মনে হয়। ছাদের উচ্চতা কখনো বেশি আবার কখনো কম মনে হয়। তাই রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্তর্ক অবলম্বন করা প্রয়োজন। শয়ন কক্ষের রং হওয়া উচিত হাতকা ও দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না এমন। যাতে দেয়ালে চোখ রাখলে আরামবোধ হয়, সহজে শুয় আসে। গাঢ় উজ্জ্বল রং মনকে উত্তেজিত করে। ফলে তা শুমে ব্যাপাত ঘটাতে পারে। অন্যদিকে বসার ঘরের জন্য কিছুটা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা ভালো। তাছাড়া নানারকম ওয়াল পেসার দিয়েও ঘরের দেয়ালকে আকর্ষণীয় করা যায়। দরজা, জানালার পর্দার রং ও গুরুত্বপূর্ণ, যা ঘরের দেয়ালের রঞ্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ঘরের কক্ষগুলো যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন তাতে যদি ব্যাথাযথভাবে আলোর প্রয়োগ করা না যায় তবে পুরোটাই ব্যথা হবে। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে যে, সুন্দর রং নির্বাচন, আকর্ষণীয় পর্দা আর আসবাবপত্রের সঠিক ব্যবহার সঙ্গেও শুধু আলোর ব্যাথাযথ ব্যবহার না করার কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সাজসজ্জার কাজটি। বিভিন্নভাবে ঘরে আলোর প্রয়োগ করা যায়। বাস্তু, স্টেলাইট, ল্যাম্পশেড, স্ট্যান্ড

ল্যাম্প প্রড়তি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিসের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত করার জন্য সেখানে স্পট লাইটের আলো ফেলা যেতে পারে। যেমন শো-পিস, পেইলিং ইত্যাদি। আবার বসার ঘরে পুরো কক্ষকে আলোকিত না করে আলো-আধারির পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর ল্যাম্পশেডের ব্যবহার ঘরের শোভা বাড়িয়ে তোলে। কেবল যথাস্থানে তা স্থাপন করতে হবে। তবে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা অনেকটাই নির্ভর করে অধিবাসীর রুচি ও চাহিদার উপর। এ বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজকে দৃষ্টিন্দন, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় করে করা সম্ভব।

নমুনা প্রশ্ন

লিখে জবাব দাও

- ১। জামদানি শাড়ি, নকশিকাঠা, জায়নামাজ, কাঠের দরজায় কী ধরনের নকশা থাকে— বিবরণ দাও।
- ২। মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডায় কী ধরনের শিল্পকর্ম ও নকশা থাকে বর্ণনা দাও।
- ৩। গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design) কাকে বলে? গ্রাফিক ডিজাইন-এর কাজের দিকগুলো উল্লেখ কর।
- ৪। ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion Design) বলতে তুমি কী বুঝ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফ্যাশনের প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
- ৫। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার (Interior Design) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৬। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় (Interior Design) কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ করতে হবে, তা উল্লেখ কর।

ব্যবহারিক : হাতে কলমে

নিচের কবিতাংশ সুন্দর হরফে লিখে চিত্রের রূপ দাও।

- ১। মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাল্লা ভাষা
—অতুলপ্রসাদ সেন
- ২। মাতৃভাষায় যাহার ভঙ্গি নাই
সে মানুষ নহে।
—মীর মোশাররফ হোসেন
- ৩। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেরুয়ারি
—আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

৪। আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাধ্যম : কাগজ ও কালো কালি

কাগজের মাপ : 5×8 ইঞ্চি ।

সময় : ২ দিন ।

- ৫। বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা, এই চারটি উপাদান দিয়ে কাগজের উপর কালো কালিতে একটি নকশাটি আঁক। নকশার মাপ 5×5 ইঞ্চি ।

সময়— ৩ ঘণ্টা ।

ফুল, পাখি, পাতা ও রেখা দিয়ে কালো রং ও অন্য একটি রঙে কাগজের উপর একটি নকশা চিত্র তৈরি কর ।

নকশার মাপ 5×5 ইঞ্চি ।

সময়— ৩ ঘণ্টা ।

- ৬। স্কুলের বাংলা শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি সুন্দর মানপত্র তৈরি কর। মানপত্রে থাকবে হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি, লতাপাতা দিয়ে নকশা। মানপত্রের কাগজের মাপ ও কত রঙের করবে তা নিজেই ভেবে নেবে ।

সময়— ৩ দিন ।

- ৭। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের জন্য একটি 8×8 পৃষ্ঠার (মাঝখালে ১টি ভাঁজ) আমন্ত্রণলিপি তৈরি কর। কার্ডের মাপ— 5×6 ইঞ্চি । রং কালো ও যে কোনো 1×1 রং ।

কার্ডের প্রথম পৃষ্ঠায়— নকশা, স্কুল ও অনুষ্ঠানের নাম ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছু নকশা ও অনুষ্ঠানসূচি ।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণলিপি ।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় নকশা দিয়ে সামান্য অলঙ্কার। প্রেসের কোনো টাইপ ব্যবহার চলবে না। হাতের লেখা ব্যবহার কর ।

সময়— ২ দিন ।

- ৮। একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের জন্য রাস্তায় আলপনা করার জন্য একটি ছোট আকারের সাদা—কালো আলপনা কাগজের উপর আঁক। কাগজের মাপ— 8×8 ইঞ্চি ।

সময়— ৩ ঘণ্টা ।

নবম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প ছবি আঁকা, বর্ণমালা শেখা, নকশা ও গ্রাফিক ডিজাইন

ছবি আঁকা

১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ এবং সরাসরি ড্রইং- ক্লাসের সংখ্যা-৫টি। মাধ্যম : পেনসিল ও কালি-কলম। শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে সরাসরি প্রকৃতির ভেতর যাবেন। কাগজ, বোর্ড, পেনসিল বা কালি-কলম নিয়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাঠে, নদীর ঘাটে বা জঙ্গলের পাশে বসে ছবি আঁকার ক্লাস নেবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতি থেকে যে কোনো বিষয়ে সরাসরি (ফ্রি হ্যান্ড) ড্রইং করবে, স্কেচ করবে- সংখ্যায় যতগুলো সম্ভব একটির পর একটি করে যাবে।

ক্লাস ছাঢ়াও ড্রইং, স্কেচ সব সময়ই একজন ছবি আঁকিয়ে ছাত্রকে করতে হয়। এ জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছে সব সময় একটি স্কেচ খাতা রাখতে হয়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেনসিল বা কলম। যখনই সময় ও সুযোগ পাবে স্কেচ বা ড্রইং করতে হয়। বেড়াতে গেলে, বাজার-হাটে, মাঠে, ট্রেনে-স্টিমারে সর্বত্রই স্কেচ খাতা থাকবে একজন শিল্পীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সব সময় নিয়মিত ড্রইং ও স্কেচ করলে একজন শিল্পী ড্রইং-এ দক্ষ হয়, সাহসী হয়ে উঠে এবং ছবি আঁকা বিষয়ে জানতে পারে অনেক।

ড্রইং ও স্কেচ ছাড়া প্রকৃতি থেকে বিষয় নিয়ে কাগজের উপর পেনসিল বা কালি-কলমে ধরে ধরে স্টাডি বা অনুশীলন করতে হবে।

এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো-

১। ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং স্কেচ ও অনুশীলন।

২। স্থিরচিত্র (স্টিল লাইফ)।ক্লাস ৫টি-কলসি, ইঁড়ি, পাতিল, বোতল, বৈয়াম, প্লাস, মাটির পাত্র বা যে কোনো পাত্র সাজিয়ে স্থিরচিত্র বিষয় করে আলোছায়া ও আঁকার অন্যান্য নিয়ম পালন করে অনুশীলন করে যেতে হবে পর পর কয়েকটি।

এক একটি ক্লাসের সময়- ৩ থেকে ৪ দিন। মাধ্যম- পেনসিল ও রঙিন প্যাস্টেল।

৩। প্রকৃতি থেকে ইচ্ছেমতো বিষয়- (কম্পোজিশন) ক্লাস- ৮টি

মাধ্যম- জলরং, পোস্টার রং, প্যাস্টেল রং বা ইচ্ছেমতো।

এক একটি ক্লাসের সময়- ৪ থেকে ৫ দিন-

প্রকৃতি থেকে বিষয় ঠিক করবে ছাত্ররা নিজের ইচ্ছেমতো। কোনো গ্রামের বাড়ি, নদীর ঘাট, নৌকা, মাছধরা, ধানকাটা ইত্যাদি। শহর হলে কোনো বস্তি, রাস্তার দৃশ্য, গলির দৃশ্য, চিড়িয়াখানার দৃশ্য, শিশু পার্কের দৃশ্য ইত্যাদি বিষয় হতে পারে। গ্রামে ও শহরে অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় সেগুলোও বিষয় হতে পারে। যেমন— যাত্রা, নাটক, কবিগানের লড়াই, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি। নিজের প্রিয় পশু—পাখিকে নিয়ে চিত্র রচনা হতে পারে। মানুষের বিভিন্ন জীবন ও পেশা নিয়ে বিষয় হতে পারে। যেমন রিকশাওয়ালা, টেলাগাড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জেলে, কামার, কুমার এমনি অনেক কিছুকে বিষয় করে রং-রেখা, আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদি নিয়মগুলো যথাসম্ভব ঠিক ঠিক তুলে ধরে একটি জমাট কম্পোজিশন বা চিত্র রচনা করতে হবে।

বর্ণমালা শেখা—

ক্লাসের সংখ্যা—তিটি (সম্ভব হলে আরও বেশি) প্রতিটি ক্লাসের সময়— ৩ দিন

- ১। ধরে ধরে বাঞ্ছা বর্ণমালা ও ইংরেজি বর্ণমালা সুন্দরভাবে লেখার জন্য কয়েকবার অনুশীলন ও অভ্যাস করতে হবে।
(প্রচলিত ছাপা হরফ থেকে)
- ২। হাতের লেখা বারবার লিখে অভ্যাস ও অনুশীলন করে সুন্দরভাবে লিখতে জানতে হবে।
- ৩। শিক্ষক একটি কবিতাংশ বা কোনো মহৎ লোকের বাণী সংগ্রহ করে ছাত্রদের দেবেন। তারা কবিতাংশ সুন্দরভাবে লিখে ও নকশা করে চিত্রের রূপ দেবে। যেমন—
‘মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাঞ্ছা ভাষা’

‘মাতৃভাষায় যাহার ভঙ্গি নাই
সে মানুষ নহে।’

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা—তিটি (সম্ভব হলে আরও বেশি), প্রতিটি ক্লাসের সময়— ৩ দিন।

- ১। বৃক্ষ, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা দিয়ে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নকশাটি তৈরি করবে।

- ক) নকশার মাপ— ৬" X ৬" সাদা—কাপো রং, কাগজের উপর— তিটি তিলু ভিলু নকশা।
- খ) নকশার মাপ— ৮" X ৮" ২ রং বা ৩ রং— কাগজের উপর— তিটি তিলু ভিলু নকশা।

গ্রাফিক ডিজাইন

ক্লাসের সংখ্যা— তিটি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

ক. স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য প্রচন্দচিত্র অঙ্কন (যে কোনো মাধ্যম)।

খ. ‘বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সমরক্ষণ’ এর উপর পোস্টার অঙ্কন (যে কোনো মাধ্যম)।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

- ১। প্রকৃতি থেকে যে কোনো বিষয়ে একটি ফ্রি হ্যান্ড ড্রাইং স্কেচ কর। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
মাধ্যম-পেনসিল বা কালি-কলম।
- ২। একটি বটগাছের গুড়ি পেনসিল মাধ্যমে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা
- ৩। একটি কচুগাছ পেনসিলে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৪। একটি নৌকা পেনসিলে ধরে ধরে অনুশীলন করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৫। আমগাছের একটি ডাল, পাতাসহ কালি-কলমে স্টাডি করে দেখাও। সময়- ৫ ঘণ্টা বা একদিন।
- ৬। তোমার সামনে মাটির পাত্র দিয়ে সাজানো স্থির বিষয়ের অনুশীলন- কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
সময়- ২ দিন।
- ৭। রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে তোমার সামনে সাজানো স্থির বিষয়টি অনুশীলন করে আঁক। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি।
- ৮। জলরৎ বা পোস্টার রং দিয়ে নিচের যে কোনো বিষয়ে একটি চিত্র রচনা কর। কাগজের মাপ- ৩০ X ৪০ সেমি।
সময়- ৩ দিন।

বিষয়- নদীর ঘাট, জেলে, মোষের পিঠে রাখাল, ধাঁচায় টিয়া পাখি, ধানকাটার দৃশ্য, কবি গানের লড়াই, বর্ণমালা ও নকশা।

দশম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প, ছবি আঁকা বর্ণমালা শেখা, নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন

ছবি আঁকা

- ১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ ও ড্রাইং ক্লাসের সংখ্যা- ৫টি।

মাধ্যম-পেনসিল, কালি-কলম ও ক্রেয়েন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণির মতো জীবজগ্নি ও মানুষকে বিষয় করে আঁকার চেষ্টা করবে। সেজন্য
শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে চিত্রিয়াখনা, বাস্ত মানুষের স্থান, হাটবাজার, রেলওয়ে স্টেশন, গ্রামে-যেখানে গরু, মোষ বেশি
পাওয়া যায় ইত্যাদি স্থানে নিয়ে যাবেন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে এবং সম্ভব হলে জলরঞ্জে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো যথাসম্ভব
মেনে অর্থাৎ আলোছায়া, পারসপেকটিভ ইত্যাদি ঠিক রেখে যত বেশি পারা যায় অনুশীলন করতে হবে। যেমন- বিভিন্ন
রকম গাছপালা, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আর স্কেচ বই বা খাতায় সব সময় স্কেচ ও ড্রাইং অবশ্যই করে যেতে হবে। স্কেচ বই হবে সব সময়ের সঙ্গী।

২। স্থিরচিত্র/ স্টিল লাইফ ক্লাস ৫টি; সময় হলে আরও বেশি। প্রতিটি ক্লাসের সময়— ৩ থেকে ৪ দিন।

শিক্ষক ক্লাসে স্থিরচিত্রের বিষয় সাজিয়ে দেবেন। স্থিরচিত্রের বিষয় নবম শ্রেণির মতো ইঁড়ি-পাতিল, বোতল, বৈয়াম, এসব দিয়েও সাজাতে পারেন। নতুন বিষয় ফলমূল, কলা, পেঁপে এবং তরিতরকারি-লাউ কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি দিয়েও সাজাতে পারেন। স্থিরচিত্র সাজাবার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে আলোচায়ার প্রতিফলন যেন ঠিকমতো হয়। দশম শ্রেণিতে আগের মতো পেনসিলে ২/১ টি ক্লাস করে পরের ক্লাসগুলো অবশ্যই জলরং মাধ্যমে করবে।

৩। চিত্র রচনা বা কম্পোজিশন ক্লাস ৫টি, সময়— ৫ দিন।

শিক্ষক, কীভাবে চিত্র রচনা করতে হয় তা ছাত্রদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বইতে চতুর্থ অধ্যায়ে কম্পোজিশন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ছাত্ররা যে বিষয়ে চিত্র রচনা করবে সেটি আগে কিছু ছোট আকারে খসড়া করে নেবে। অন্ততঃ ৩/৪টি খসড়া থেকে সবচেয়ে সুন্দরটি শিক্ষক বেছে দেবেন। সেটি জলরঙে, পোস্টার রঙে বা প্যাস্টেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছেমতো যে কোনো রঙে আঁকবে। বিষয় গ্রহণ করবে প্রকৃতি থেকে ও জীবন্যাপন থেকে। নবম শ্রেণিতে সেই বিষয়গুলোর উপরে রয়েছে।

বর্ণমালা শেখা- ক্লাসের সংখ্যা— ৩টি, সময়— প্রতিটি ক্লাস—৩দিন। নবম শ্রেণি থেকে বর্ণমালা লেখার চর্চা করবে। হাতের লেখা চর্চা করে আরও সুন্দর করবে। কয়েকটি ক্লাস করবে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করার জন্য।

(ক) মানপত্র তৈরি, (খ) পোস্টারচিত্র তৈরি, (গ) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি তৈরি, (ঘ) শুভেচ্ছাপত্র তৈরি। নববর্ষের কার্ড, ইদ কার্ড, জন্মদিনের কার্ড ইত্যাদি।

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা ৩টি— প্রতিটি ক্লাস— ৩ দিন

(ক) বৃক্ষ, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, রেখা ও ফুল—পাতা সমন্বয়ে ইসলামিক ডিজাইন তৈরি করবে। শিক্ষক নকশা তৈরির বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

(খ) ছাত্ররা নিজের ভেবে—চিত্রে কিছু নকশা তৈরি করবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। যেমন— চাদর, পর্দা, ছোটদের জামা—কাপড়, পাঞ্জবি, শাড়ি, সোফা, কুশন, টেবিল কাপড় ইত্যাদি।

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

ক্লাসের সংখ্যা— ২টি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

শিক্ষার্থী নিজের বা পরিবারের জন্য দুটি পোশাকের নকশা অঙ্কন করবে।

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

ক্লাসের সংখ্যা ২টি, প্রতিটি ক্লাস—২দিন। বসার কক্ষ ও শয়ন কক্ষের দুটি করে নকশা অঙ্কন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত আসবাব ও পর্দা এবং দেয়ালের রং একে দেখাবে।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

- ১। সামনে বাঁধা গরুটির বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকটি ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং ও স্কেচ কর। সময় – ১ দিন।
- ২। প্রকৃতি থেকে তোমার ইচ্ছেমতো ১টি ড্রইং ও স্কেচ করে দেখাও। সময় – ১ দিন।
- ৩। একটি আমগাছ বা বাঁশ ঝাড় পেনসিলে বা কালি-কলমে অনুশীলন করে দেখাও।
- ৪। একটি কুঁড়েঘর ও তার পরিবেশ পেনসিল বা কালি-কলমে অনুশীলন করে দেখাও। কাগজের মাপ- 25×37 সেমি., সময়- ১ দিন।
- ৫। তোমার সামনে সাজানো স্থির জীবন চিত্রটি জলরৎ দিয়ে আঁক। সময়- ৩ দিন।
- ৬। সবজি দিয়ে সাজানো স্থির জীবন চিত্রটি প্যাস্টেল রঙে বা জলরঙে আলোছায়ার প্রতিফলনসহ আঁক। কাগজের মাপ- 25×37 সেমি., সময়- ৩ দিন।
- ৭। জলরৎ বা পোস্টার রঙে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ে চিত্র রচনা কর। মূল চিত্রের সাথে চিত্র রচনার খসড়াগুলো জমা দিতে হবে। কাগজের মাপ- 30×40 সেমি. বা $15'' \times 18''$, সময়- ৫ দিন। বিষয়- জেলে, তাঁতি, গরুঁগাড়ি, কলসি কাঁখে বধু, পাথি বিক্রেতা, বেদে, পালতোলা নৌকা, নৌকাবাইচ, ধান কাটা, ধান মাড়াই, ফেরিওয়ালা, যে কোনো মেলা, ধান ভানা, পিঠা বানানো, একুশের প্রভাতফেরি, মিছিল, মেলা ও ঈদ। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিষয় ঠিক করে তা দিয়ে চিত্র রচনা পরীক্ষা দিতে পারে। শিক্ষক সেভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাস্তব ও স্মৃতি থেকে অনুশীলন



এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা—

- সিল লাইফ বা স্থির জীবন নিয়ে হ্যাবি আকতে গারব।
- মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর হ্যাবি আকতে গারব।
- প্রকৃতি ও পাখিপার্শ্বিক অঙ্গ নিয়ে হ্যাবি আকতে গারব।
- স্মৃতি থেকে বিভিন্ন ঘটনা বা বিবরণিতিক হ্যাবি আকতে গারব।
- টাইলস নিয়ে মোজাইক পেইলিং করতে গারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

সিল্স শাইক ও শিরকলা (অঙ্গ ঝীবন)

অক্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা দৈনন্দিন ব্যবহৃত নানা শকারের কস্তুর বা জিনিসের এককভাবে অনুশীলন করেছি। এখন আমরা কতগুলো কস্তুর বা জিনিসকে একত্রে সাজালেও যে এটি একটি আলাদা বিষয় হয়ে শিখগুলে প্রকাশিত বা উপস্থাপিত হতে পারে তা জানব।

খিরচিত্র অঙ্গনে যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো বিষয়বস্তুর আকার আকৃতির সুসংযোগ বিষয় নির্বাচন, বিষয় সাজানো সর্বোপরি আলোর দিক নির্দেশনা সংক করে বাস্তবতাবে পৰিভাব অঙ্গন করা যাব তা শিককের সাহায্যে এবং নিম্নের চিত্র থেকে ধারণা নিয়ে তোমরাও মনেরমতো বিষয় নির্বাচন করে অনুশীলন করতে পারবে।



শোন্টার রঙে আকা সিল্স শাইক বা খিরচিত্র

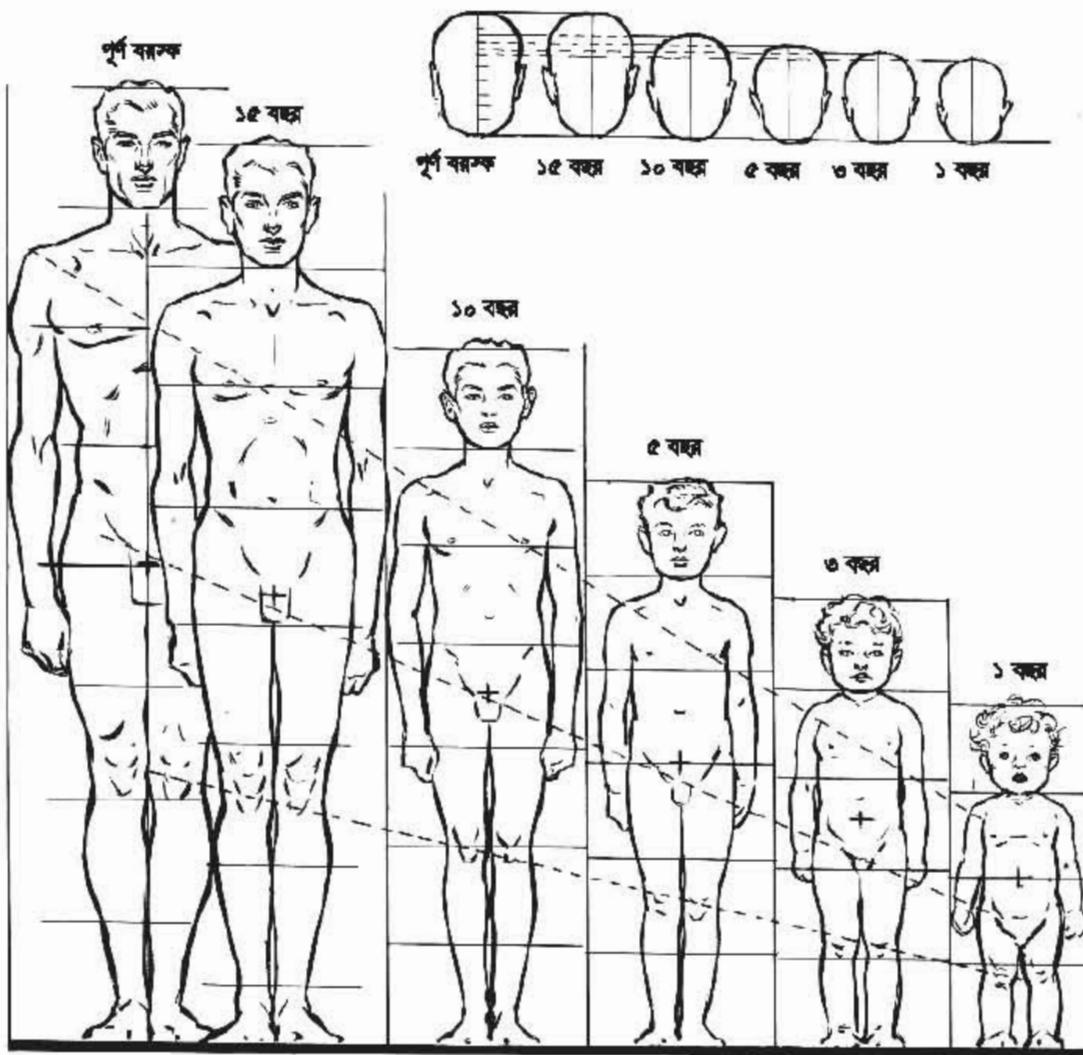
পাঠ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২

মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আকার অনুশীলন

অক্টম শ্রেণিতে মানুষ ও প্রাণী আকার প্রারম্ভিক অনুশীলন আমরা জেনেছি। এখন আমরা জানব মানুষ আকার কিন্তু কাঠামোগত কৌশল। ছোট শিশু থেকে পূর্ববয়স্ক একটি মানুষের ছবি আকার ক্ষেত্রে কতগুলো মাপজোকের নিয়ম আছে। বৰস তেজে মানুষের দেহ অবকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। একটি শিশুর ছবি আকার পরিমাপকের সাথে একজন পূর্ববয়স্ক মানুষের ছবি আকার পরিমাপকের ডিনুতা রয়েছে। বেমন— একটি ছোট শিশুর ছবি আকার সময় যদি তার মাথার মাপকে

ଏକକ କରେ ନେଇ ତାହଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଖରୀର ଯେମନ ୪୩ ମାଗେ ବିଭାଜନ କରା ଯାବେ, ତେମନି ଏକଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଷକ ମାନୁଦେଵ କେତେ କିମ୍ବୁ ସେଟ୍ ହେବେ ନା । ତାର ମାଧ୍ୟମ ମାପ ଏକକ କରେ ବିଭାଜନ କରିଲେ ତା ୭ କିମ୍ବା ୮ ଗୁଣେ ତାପ କରା ଯାବେ ।

ନିମ୍ନୋର ଚିତ୍ରେ ଏକଟା ଛକ୍ର ମାଧ୍ୟମେ ତା ଦେଖାନ୍ତେ ହୁଲୋ ।



କିମ୍ବୁ ସବଳେ ମାନୁଦେଵ ଦୈରିକ ପତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଶିକ୍ଷକର ସହଯୋଗିତା ନିମ୍ନେ ତୋମରା ଅନୁଶୀଳନ କରିଲେ ଏ ବିଷୟେ ଆରା ଦକ୍ଷତା ନିଜେରାଇ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ତାହାରେ ମାନୁଦେଵ ପତ୍ର-ଶ୍ରକ୍ତିର ଉପର ଏକଟୁ ଗତିରଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଲେ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନେର ସମସ୍ତର କରେ ତୋମରା ତୋମାଦେଇ ଅଭିଭିତ ଛବିତେ ମାନୁଦେଵ ସାଥେ କୋଣୋ ଥାରୀର ଛବି ସହ୍ୟାଜଳ କରେ ଆରା ପାଶକତ କରେ ଫୁଲତେ ଗାରବେ ।

পাত : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯

প্রকৃতি থেকে অনুশীলন

আমরা এতদিন অভিনিষ্ঠার ছবি এঁকেছি। এখন আমরা বাস্তবের একটা ছবি কীভাবে আঁকা যাবে, সে বিষয়ে জানব। আমরা যে দেখানেই থাকিলো কেন তার চারপাশে আকৃতিক পরিবেশ আছে। তোমার পারিপার্শ্বিকভাব যে দৃশ্যটি তোমার বেশি ভালো লাগে— কোনো এক ছুটির দিনে সেখানে কাপড়, বোর্ড, পেনসিল নিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মের আলোকে এবং শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করে দিবে। এখানে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো তোমার কাপড়ে বা ক্যানভাসে তোমার নির্বাচিত বিষয়ের কোন অংশটুকু আঁকবে তা মনে মনে তেবে নিবে। আরও একটি বিষয়ের দিক খেয়াল রাখতে হবে তা হলো— ভূমি যে সময় ছবিটি আঁকবে সেই সময়ের আলোর নির্দেশনা, যেমন— ভূমি যদি সকল নরটাই ছবিটি আঁক তাহলে সূর্যের আলো পূর্ব দিকে আঁকবে পশ্চিম দিকে ছায়া পরবে। আবার বাত্রাটির পর দুইটা কিলো তিস্টোর সময় যদি ভূমি ছবিটি আঁক তাহলে আলো পশ্চিম দিক থেকে আসবে এবং পূর্ব দিকে ছায়া পরবে। প্রকৃতির সাথে আলোছায়ার যে নির্ধিত সম্পর্ক তা জ্ঞেন ভূমি যখন ছবি আঁকবে তখন তোমার ছবিই বলে দিবে এটা কোন সময়ে এঁকেছে। আকৃতিক দৃশ্য বা যে কোনো ছবি আঁকার সময় এ ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে।



পেনসিলে আঁকা আকৃতিক দৃশ্য

পাঠ: ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫

স্মৃতি থেকে অনুশীলন

আজকে যা কিছু আমরা বাস্তবে অবলোকন করি আগামীকাল তা হয়ে যায় স্মৃতি। আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা আছে যা স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। কোনো কোনো স্মৃতি থাকে মধুর আবার অনেক স্মৃতি থাকে বেদনার। সে সব স্মৃতিনির্ভর হবি আকতে গেলে আমাদের ক্ষিয়ে যেতে হয় সেই সময়ে। চোখ বুঁচলেই দৃশ্যকরে তেসে ওঠে ঘটনার হৃবত্ত বর্ণনা। একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করে আমরা সে সব ঘটনার বর্ণনা নিয়েও হবি আকতে পাই। যেমন— বার্ষিক পরীক্ষার পর বিদ্যালয় থেকে তোমাদের শ্রেণির সব বক্ষ্যাশ শিক্ষকদের নিয়ে দূরে কোনো মনোরম পরিবেশে শিক্ষা সফরে গেলে। সেখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ, দর্শনীয় স্থানগুলো সকলে মিলে উপভোগ করেছ। যা এখন তোমার মনের মাঝে গৈথে আছে। গভীরভাবে ইচ্ছা করলে ভূমি সে স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে একটা মজার হবি একে ফেলতে পার। তেমনিভাবে তোমার স্মৃতিবিজ্ঞানিত যে কোনো ঘটনা নিয়েও হবি আকতে পার।

পাঠ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০

মোজাইক পেইণ্টিং (Mosaic Painting)/ দেওয়ালচিত্র বা মূরাল (Mural)

মূরাল শিল্প হিসেবে অত্যন্ত প্রাচীন। সাধারণত পাবলিক প্লেস বা জন সমাজম হয় এ রকম স্থানে, কোনো ভবন বা দেয়ালে বড় আকারের যে ছবি করা হয়, তাকে মূরাল বলে। বড় বড় হোটেল, রেস্টোরাঁ, অফিস ভবন, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন রাস্তায় পুরুষপূর্ণ স্থাপনাতে মূরাল হয়ে থাকে। গ্রেজ টাইলস এ নির্মিত হয় বলে গ্রোদ, বৃক্ষ, ঝুঁট, খুলা-বালি ও অন্যান্য প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে মূরাল টিকে থাকতে পারে। সে জন্য খোলা জায়গায় বা ভবনের বাইরের দেয়ালে মূরাল নির্মাণ করা হয়। মূরালকে মোজাইক চিত্র বা Mosaic Paintingও বলা হয়।

নানা রঙের গ্রেজ টাইলস দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। আমরা দেয়ালে লাগানোর জন্য যে সব টাইলস ব্যবহার করি চিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রং নির্বাচন করে সে সব টাইলস দিয়েই মোজাইক চিত্র বা মূরাল নির্মাণ করা যায়। তবে ছোট ছোট রঙিন পাথরের টাইলস এর এবং কাচের টুকরা বা নানা ধরনের সিরামিক পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা দিয়েও মোজাইক চিত্র করা সম্ভব।



রিষভ টাইলস তেজে মোজাইক ছবি

নির্মাণ পদ্ধতি

মূরালের জন্য প্রথমে নির্ধারিত ছবির ছোট লে-আউটকে প্রয়োজন অনুযায়ী বড় করে নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট আকারের ছবিটিকে যে জায়গায় মূরাল তৈরি হবে সে জায়গার মাপ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বড় করে নিতে হবে। নকশা বা ছবিটি মাপমতো কাগজে বা রেঙ্গিন পেপারে রং দিয়ে ঢঁকে নিতে হবে। পরে ঐ কাগজ বা রেঙ্গিন (আজকাল ছোট ছবি বা লে-আউটকে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাপে বড় করা হয়) মেঝেতে বিছিয়ে নিতে হবে। এবার নকশা বা ছবির রং অনুযায়ী রঙিন টাইলস এর ছোট ছোট টুকরা উল্টোপিঠ নিচে এবং রঙিন পিঠ উপরে রেখে ছবির ওপর বসিয়ে দিতে হবে। পুরো ছবিতে রঙিন টুকরা টাইলস সাজিয়ে দিলে কাগজে রেঙ্গিনে অঙ্কিত ছবি অনুযায়ী রঙিন মূরালচিত্র সম্পন্ন হবে। এরপর ভালোভাবে ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উপরের ধূলা-বালি ও অন্যান্য ময়লা বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটু মোটা কাগজে ময়দার আঠা মেখে সাবধানে সেই কাগজ সাজানো টাইলসের ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। আঠা শুকানোর পর ছোট ছোট অংশে ছবিটিকে ভাগ করে দাগ দিয়ে নিতে হবে। ভাগগুলোর ক্রম বা সিরিয়াল যাতে ঠিক থাকে সে জন্য এতে নম্বর বা চিহ্ন দিতে হবে। তারপর দাগ অনুযায়ী কাগজসহ ছবিটিকে ছোট ছোট টুকরা অংশে কেটে নিতে হবে। সুন্দরভাবে প্যাকেট করে যে স্থানে বা দেয়ালে মূরাল তৈরি হবে, স্থানে নিয়ে যেতে হবে তারপর দেয়ালে সিমেন্টের আস্তর দিয়ে তার ওপর স্ল্যাব বা কাটা অশ্বগুলো পূর্বের ক্রম অনুযায়ী বসিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কাগজের দিকটা ওপরে থাকে। সমস্ত অংশ সিমেন্ট লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকানোর পর পানি দিয়ে কাগজ ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ কাগজ তুলে ফেলতে হবে, তা হলেই প্রয়োজনীয় মূরালচিত্রটি পাওয়া যাবে। কাগজ তোলা শেষ হলে ছবিটি ভালোভাবে পানি ও শুকানো সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সাদা সিমেন্টের সাথে রঙিন অঙ্গাইড মিশিয়ে পুটিং করা যেতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক

১. স্থিরচিত্র (still life) অঙ্কনের কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনে রাখা প্রয়োজন।
২. বাস্তব ছবি অঙ্কনের সময় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা তোমার আউটডোরের একটি ছবি আঁকার মাধ্যমে বর্ণনা কর।
৩. বয়স ভেদে মানুষের দৈহিক আকার-আকৃতির পরিমাপের যে তিন্নতা তা অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধর।
৪. মোজাইক পেইন্টিং (Mosaic Painting) নির্মাণের কৌশলগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

কারুকলা

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

বাঁশ ও বেতের কাজ

- বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব। যেমন— পুতুল, ফুলদানি, ছাইদানি, কলমদানি ইত্যাদি। বাঁশের চালন, ঝুড়ি, খালই, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি তৈরি করতে পারব।
- বেতের সাধারণ পাটি ও নকশি পাটি তৈরি করতে পারব।
- ছেট ছেট খালই, ঝুড়ি তৈরি করে ঘর সাজাতে পারব।

কাপড় ছাপা

- রঙের নামগুলো জানব।
- কাপড়কে রংকরণ ও ছাপার জন্য উপযোগী করে তৈরি করতে পারব।
- কাপড় রং করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লক তৈরি করতে পারব, ব্লক দিয়ে কাপড়ে ছাপ দিতে পারব।
- টাইডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপার কাজ করতে পারব।
- মোম বাটিক পদ্ধতিতে কাপড় ছাপতে পারব।
- কাঠ কেটে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করতে পারব।

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

- ভাঙা ইঁড়ি-পাতিল দিয়ে বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- ফেলনা তার দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- এই শিল্পকর্ম দিয়ে নিজের ঘর সাজাতে পারব।
- মাটির ছ্যাব দিয়ে শিল্পকর্ম (টেরাকোটা) তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

বাঁশ ও বেতের কাজ

বাঁশ আমরা সবাই দেখেছি। আমাদের দেশে নানা প্রকার বাঁশ পাওয়া যায়। যেমন—বরাক, মাখাল, জাই, মুলি, চিকন প্রভৃতি। দেশের তিনি ভিন্ন জায়গায় একই বাঁশ হয়তো তিনি ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— বরাক সিলেটে বরুয়া এবং নোয়াখালীতে বরো নামেও পরিচিত। মাখাল বাঁশকে কোথাও বাকাল আবার মুলিকে কোথাও বা বেতো বাঁশ বলা হয়।

বেত আমাদের কাছে পরিচিত। মোটা ও সরু, সাধারণত দুই ধরনের বেত সচরাচর আমরা দেখে থাকি। মোটা লম্বা বেত, গোল্লা বেত এবং চিকন বেত জালি—বেত নামে পরিচিত। এই বাঁশ ও বেত দিয়ে ঘর—দরজা, চেয়ার—টেবিল, আলনা, দোলনা, ডালা, কুলো, খেলনা এবং আরো কত সুন্দর জিনিস যে তৈরি করা যায় তা বলে শেষ করা যায় না।

কিন্তু সব বাঁশ দিয়ে সব কাজ হয় না। সব বেত দিয়েও না। যে কাজের জন্য যে বাঁশ সবচেয়ে বেশি উপযোগী সে কাজে সে বাঁশই ব্যবহার করতে হয়। বেতের বেলায়ও তাই—কাঠামোর জন্য ব্যবহার করতে হয় গোল্লা বেত আর বাঁধন নকশা ও বুনন এর জন্য জালি বেত। এ হলো সাধারণ নিয়ম। তাই কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে ঐ কাজের উপযোগী প্রয়োজনীয় বাঁশ—বেত সংগ্রহ করে নেব। কিন্তু সব সময়ই তো আর ইচ্ছেমতো সব জিনিস পাওয়া যায় না। হাতের কাছে যখন যে জিনিস পাব তা দিয়েই সবচাইতে কম খালুনিতে সব চেয়ে সুন্দর কী জিনিস তৈরি করা যায় তা চিন্তা করব। একখন বাঁশ পেলে সেটা ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখব ও চিন্তা করব এ দিয়ে কী তৈরি করা যায়। ফুলদানি, ট্রি, ডালা, কুলো, ঝুড়ি, নৌকা, পুতুল, বাঁশি না অন্য কোনো কিছু?

উপকরণ

কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে বাঁশ, বেত ছাঢ়াও যন্ত্রপাতি ও আরো কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন— ধারালো দা, ছুরি, করাত, হাতুড়ি, বাটাল, তুরপুন, শিরীষ কাগজ ভাঙা কাচের টুকরা, ছোট বড় তারকাটা এবং বাঁশ বেত ও কাঠ জোড়া দেওয়ার উপযোগী শক্ত আঠা ইত্যাদি। যারা আমরা শহরে বাস করি সহজেই পেলিগাম, আইকা, অ্যাক্রেলিক এসব উন্নতমানের বিদেশে তৈরি আঠা সংগ্রহ করে নিতে পারি। কিন্তু মফসবতের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই সহজলভ্য ও বেশ শক্ত আঠা তৈরির একটি পদ্ধতি এখানে জেনে নিই।

ময়দার সাথে পানি মিশিয়ে রুটি তৈরির উপযোগী একটি পিণ্ড বা গোলা তৈরি করি। এক টুকরা পাতলা কাপড়ে ঐ পিণ্ডটি ভালো করে বেঁধে নিয়ে গামলায় পানিতে, হাতের মুঠোয় চেপে চেপে ধুতে থাকি। গামলার পানি মাঝে মাঝে বদলাব এবং যতক্ষণ ঐ পিণ্ড থেকে ময়দা ধোয়ার সাদা পানি বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধোবো। ধোয়া শেষ হলে দেখব কাপড়ের বাঁধনে ছানার মতো নরম কিছু জিনিস জমে আছে। একটি পাত্রে তা যত্ন করে তুলে রাখি। এর সাথে সামান্য কিছু পান খাওয়ার চুন খুব ভালো করে মেশালেই খুব ভালো আঠা তৈরি হবে। চুন মেশানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আঠা ব্যবহার করতে হবে তা না হলে শক্ত হয়ে যাবে। চুন না মেশালে ছানার মতো অবস্থায় এই আঠা দুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। বাঁশ ও বেত দিয়ে কেমন করে কী জিনিস তৈরি করা যায় এবার জেনে নিই।

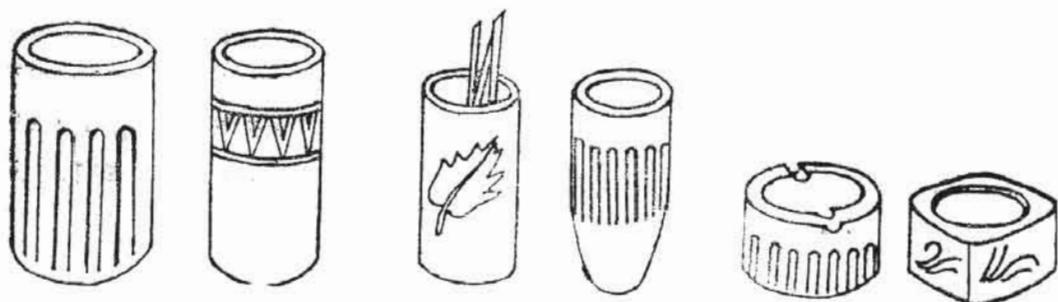
পাঠ : ২ ও ৩

ফুলদানি

বাঁশ দিয়ে খুব সহজে ফুলদানি তৈরি করা যায়। ফুলদানির জন্য মোটা ফাঁপা বরাক বাঁশের প্রয়োজন। বাঁশ যেন পাকা ও ফর্মা—১১, চারু ও কারুকলা—৯ম—১০ম

শুকনো হয়। শক্ত রাখব বাঁশের গায়ে বেন কোনো ফাটল না থাকে, পোকায় কাটা না হয়। বাঁশের পিটগুলো ধারালো দা দিয়ে ঢেঁছে সমান করে নেব বেন হাতে না শাগে। করাত দিয়ে খুব সাবধানে গিটের এক বা দেড় ইঞ্জি নিচে কেটে নেব। শক্ত রাখব বেন গিট কেটে ছিপ না হয়ে যায়। বাঁশ যেমন মোটা তার সাথে মিল রেখে ফুলদানির উচ্চতা ঠিক করতে হবে। বাঁশের ব্যাস মেপে নিয়ে তার দিগ্ধি উচ্চতা রাখলে মানানসই হয়। তালো শাগলে এর চেয়ে লম্বা করেও কাটতে পারি। উচ্চতা ঠিক করে খুব সাবধানে করাত দিয়ে কেটে নিই। খেয়াল রাখব কাটার সময় বেন ফেটে না যায়। এই তো মোটামুটিভাবে একটা ফুলদানি তৈরি হলো। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘবে ফুলদানির মুখ ও তলা মসৃণ করে নিই। এবার এটাকে কত বেশি সুন্দর করা যায় তা ভেবে চিহ্নিত করতে হবে। বাঁশের উপরের মসৃণ অংশ ঢেঁছে তুলে নিলে ভেজর থেকে লম্বালম্বি আশের সুন্দর স্তর বের হয়। স্বাভাবিক মসৃণ অংশ ও টাঁছা অংশের মধ্যে রঞ্জেরও তারতম্য হয়। এই তারতম্যকে ফুলদানির গায়ে নকশা করার কাজে শাগানো যায়। টাঁছা অংশ অবশ্যই শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘবে মসৃণ করে নেব। এভাবে পছন্দমতো নকশা করার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল ভার্নিশের চকচকে প্রস্তেপ দিয়ে নেব। অন্যান্য পন্থতিতেও নকশা করা যায়। বাঁশের স্বাভাবিক মসৃণ পিঠ সম্পূর্ণরূপে ঢেঁছে তুলে কেলে শিরীষ কাগজে ঘবে পলিশ করে নিয়ে এনামেল বা অন্য কোনো রং দিয়ে পছন্দমতো নকশা করব। এই রং শুকিয়ে যাওয়ার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল ভার্নিশের প্রস্তেপ দিয়ে নেব। ভার্নিশে জিনিসটি যেমন চকচকে হয় তেমনি পোকায় কাটারও ভয় থাকে না।

উপরে দেয়া একই নিয়মে পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, ছাইদানি, প্লাস ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। ছাইদানির উচ্চতা পরিমাণমতো কমিয়ে নেব, প্লাসের মুখ ভেজর থেকে ঢেঁছে পাতলা করতে হবে আর নিচের দিকটা ঢেঁছে সরু করে নিলে সুন্দর দেখাবে। পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র এবং প্লাসের জন্য অপেক্ষাকৃত সরু পাতলা বাঁশ ব্যবহার করব। মুলি বা বেতো বাঁশের পোড়ার দিকটা এ কাজের জন্য উপযোগী। ছাইদানির জন্য মোটা ও পুরু বাঁশের প্রয়োজন। নিচের ছবিতে ফুলদানি, পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, প্লাস ছাইদানি প্রস্তুতির কিছু নমুনা আছে। এমনি করে বাঁশ কেটে ও ছেটে আরো বিভিন্ন নকশায় কেলে বিভিন্ন গড়ন ও গঠনের জিনিস তৈরি করতে পারি।



বাঁশের তৈরি নালা রাখন ফুলদানি, কলমদানি, ছাইদানি

উপরে আলোচিত জিনিসগুলো তৈরি করতে বাঁশ চেরা অথবা ছিলার প্রয়োজন হয় না। শুধু কেটে নিলেই হলো। এবার যে সব জিনিসের কথা জানব, সেগুলো তৈরি করতে হলে বাঁশ চেরা ও ছিলার প্রয়োজন হবে। তাই আগেই এ সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। বাঁশকে চিরে ও ছিলে ব্যবহারের উপযোগী ও আকৃতির প্রকারভেদে মোটামুটিভাবে চার ভাগ করা যায়। যেমন— চাটা, শলা, বেতি ও পাতি।

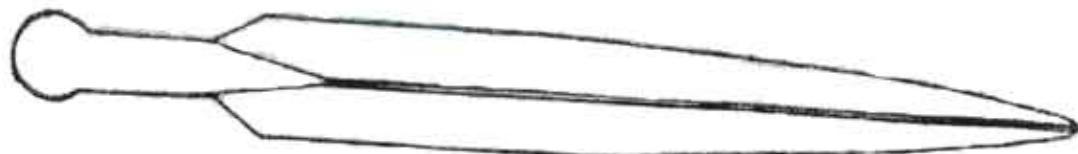
পাতি : ৪, ৫ ও ৬

চটো : বাঁশের সম্মালনিকাবে চিঠে চেহে কিছুটা মসৃণ করে নিশেই বাঁশের টটা তৈরি হয়। শলা সাধারণত দেখতে শোল এবং সম্মা। প্রয়োজনবোধে শলা খুবই সহু করা যায়। প্রয়োজনমতো সম্মা-সম্মি করা যায়, তবে মুই তিন হাতের বেশি নহ। শলা তৈরির অন্য মাধ্যম বা বাকল বাঁশের প্রয়োজন। বাসেকট, মাছ ধরার সময়ে, সোনা প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে শলা ব্যবহার করা হয়।

বেতি : মূলি বা বেতো বাঁশ দিয়ে বেতি তৈরি করতে হয়। অধুনত টটা তৈরি করে বুকের মিকটা তালো করে চেহে দিয়ে বেতি সহু করে চিঠে ও হিলে কিছুটা মসৃণ করে নিতে হয়। বেতি সাধারণত চারবকেপ বিশিষ্ট, চঙ্গা ও সহু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতি পুরু চেহে চঙ্গা কিছুটা বেশি রয়। কুকুরি, ধানী, মাছ ধরার সময়ে প্রভৃতি তৈরি করতে বেতির প্রয়োজন।

গাতি : গাতি তৈরির অন্য মূলি বা বেতো বাঁশের একমত প্রয়োজন। বাঁশের পিঠ ও বুকের মাঝামাঝি অংশটুকু খুব সাবধানে পরতের পর পরত হিলে নিয়ে গাতি তৈরি করতে হয়। বীচা বাঁশ থেকে গাতি হিলা সহজ, তবে কোনো কিছু বেনম আপে এই গাতি তালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বাঁশ দিয়ে গাতি তৈরি করা খুবই কঠিন। গাতি হিলার আপে শুকনো বাঁশ মুই তিন দিন পানিতে ডিজিয়ে রাখব। গাতির আকৃতি চাটো এবং পাতলা, এক সূতা থেকে ইকি খানেক চঙ্গা এবং ধ্রয়োজন অনুযায়ী সম্মা। সূচ ও খুব পাতলা গাতি এক হাত সেতু হাতের বেশি সম্মা রাখা যায় না। কুলো, ডালা, চলনি, পাথা ও অন্যান্য জিনিস বুলন এর কাছে গাতি ব্যবহার হয়।

বাঁশের টটা দিয়ে আমরা নানাকার ধরোজনীয় ও সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারি। বেমন— কাপড় কাটার ছুরি, খাতুয়ার টেবিলের ছুরি, চামচ, কাটা ইত্যাদি। বাঁশের টটা দিয়ে লোকও তৈরি করতে পারি।



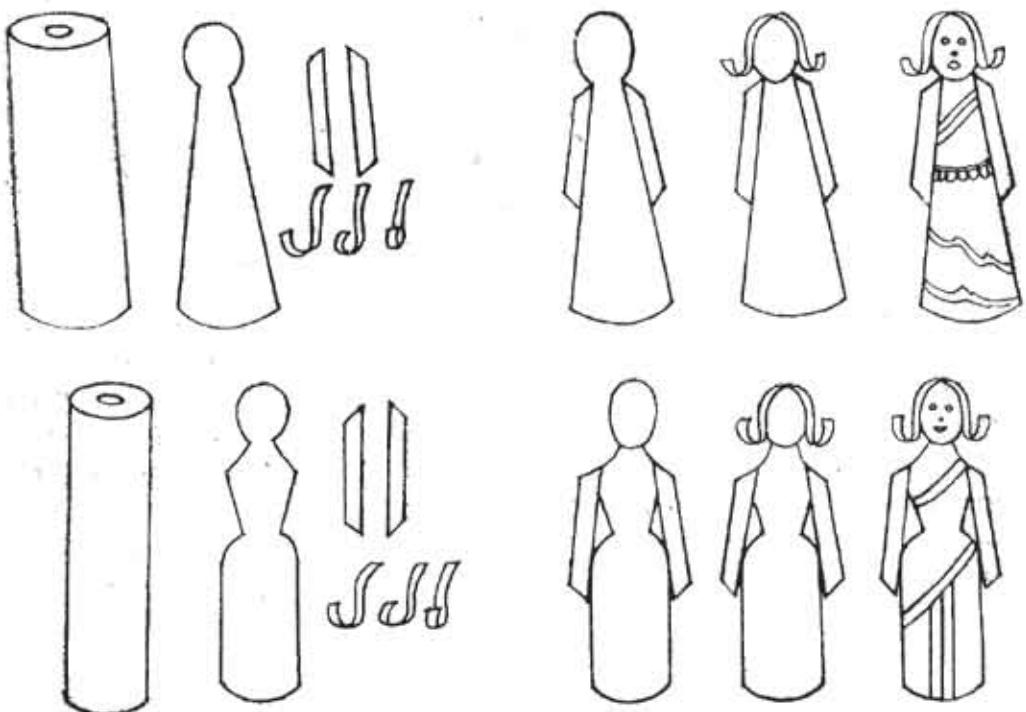
কাপড় কাটার ছুরি

এ সুটি জিনিস তৈরি করার একই নিয়ম। এলুমোর আকৃতিতে খুব সাধারণ ব্যবহার। ইকি বাসেক চঙ্গা ও আট/সর ইকি সম্মা পাকা বাঁশের টটা নিই। বুকের মিকের নরম অংশটা কেলে নিয়ে চেহে প্রয়োজনবতো গাতলা করি। পিঠের মিকটা সাধারণ চেহে নিই শাতে বাঁশের বাঁশ দেখা যায়। ছুরির বাটোর মিকটা বেল অপেক্ষাকৃত পুরু থাকে। খুব সাবধানে খিলো দিয়ে ছবির আকৃতির অনুকরণে কাটি। কাপড় কাটার ছুরির মুদিক এবং খাবার টেবিলের ছুরির আকৃত দিক খালালো করে নিই। এবার তাড়া কাতোর কুকুরা দিয়ে একটু চেহে খুব যিহি শিলীষ কাপড় দিয়ে ঘরে খুব মসৃণ করি এবং বেশোল কার্নিশের অঙ্গে দেই।

পুরু

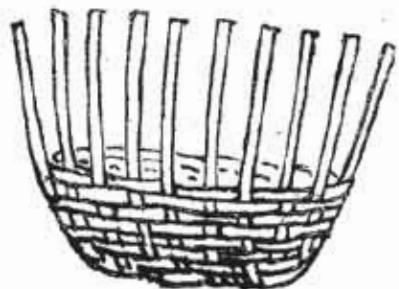
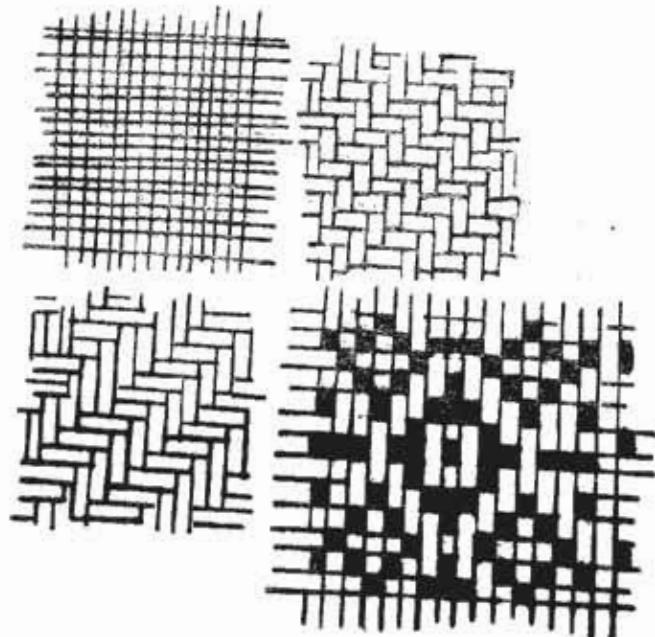
বাঁশ দিয়ে সূলের সূলের পুরুলও তৈরি করা যায়। পুরুলের অন্য এক ইকি থেকে আড়াই ইকি ব্যাটের পুরু বাঁশের ধ্রয়োজন। তিউনের ছিল মেল খুব ছোট হয়। চিকন বাঁশের পোকার মিকটাই উপযোগী। বাঁশের ব্যাস হত বেশি হবে

পূজ্যের উচ্চতা তত বাঢ়বে। নিচের ছবিতে দুই ধরনের পূজ্য তৈরির বিভিন্ন স্তর পর পর দেখে নিই। হ্রদি মেধি এবং সে অনুমতি পূজ্য দৃষ্টি কৈরি করি। শাখার ছলের জন্য খুব মসৃণ ও পাতলা করে বাষ্পের পাতি হিলে নিই। পাতিপূজ্যের মাথা পেনসিল অথবা আজ্ঞা সরু বেনেো বিকৃতে পেটিয়ে আগুনের জীব কিসেই সব সময় বীক থাকবে। পূজ্যের হাতপুজো বাষ্পের কাঠি সিয়ে তৈরি করি। পূজ্যের মূল ও বাত আঁচা দিয়ে আগোব। মূল আগোনোর আপেই হিছি শিয়াব কলজে হবে পূজ্যটি মসৃণ করে নিই। মূল আগোনোর পর তারিখের প্রসেপ দেব। তারিখ পুরোপুরি শুকিয়ে পেল এনামেল রং দিয়ে হাতকা করে ঢোখ, মুখ থাকব, নাকের টিক দেব এবং কাপড়-কোপড় বুরাবার জন্য হ্রদি আৰুব, নকশা করব ও মাথার চুলপুজো কা঳ো করে দেব।



বীশ সিয়ে বিভিন্ন হকমের তৈরি পূজ্য

নামা গ্রন্থের জিনিস ছাড়াও আয়ামের তৈরিতে জিনিসে বীশ বেতের জিনিসের ব্যবহার খুবই বেশি। ভাঙা, কূলা, চালনি, টুকরি, ধানই, ধান ধরার বিভিন্ন সমস্যায় ছাড়া আয়ামের সুবি নির্ভর সহজ আচল। উপরোক্ত জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য প্রথমে কুনন পেখা প্রয়োজন। যত ধরানোর কুনন আছে, কুনে কুনে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নকশা ও তোলা যাব। সাধারণত একথারা, সুধারা ও তেখারা কুননের প্রচলন খুব বেশি। সহজভাবে বেয়ন বোনা আৱ তেয়নি কুৰুণি শাকিয়ে ঝোপাণত কুনে নিচ থেকে উপরে ঝুঠা যাব। প্রয়োজনবোধে শুগু থেকে নিচেও নামা যাব। কুশলি পাকানো কুনায় ও একথারা, সুধারা ও তেখারা পদ্ধতি প্রচলিত। হাতপাখা কিবো বেনেো সৌধিন জিনিসের মধ্যে কুনে নকশা তোলার জন্য রাখিন পাতি ব্যবহার করা হয় এবং নকশার প্রয়োজনে একথারা, সুধারা, তেখারা পদ্ধতি কুননের সহজ্যতা করা যাব। ছবিতে পর পর একথারা, সুধারা, তেখারা কুশলি পাকানো ও নকশা কুননের নথুনা দেখে নিই। এবাব নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই।

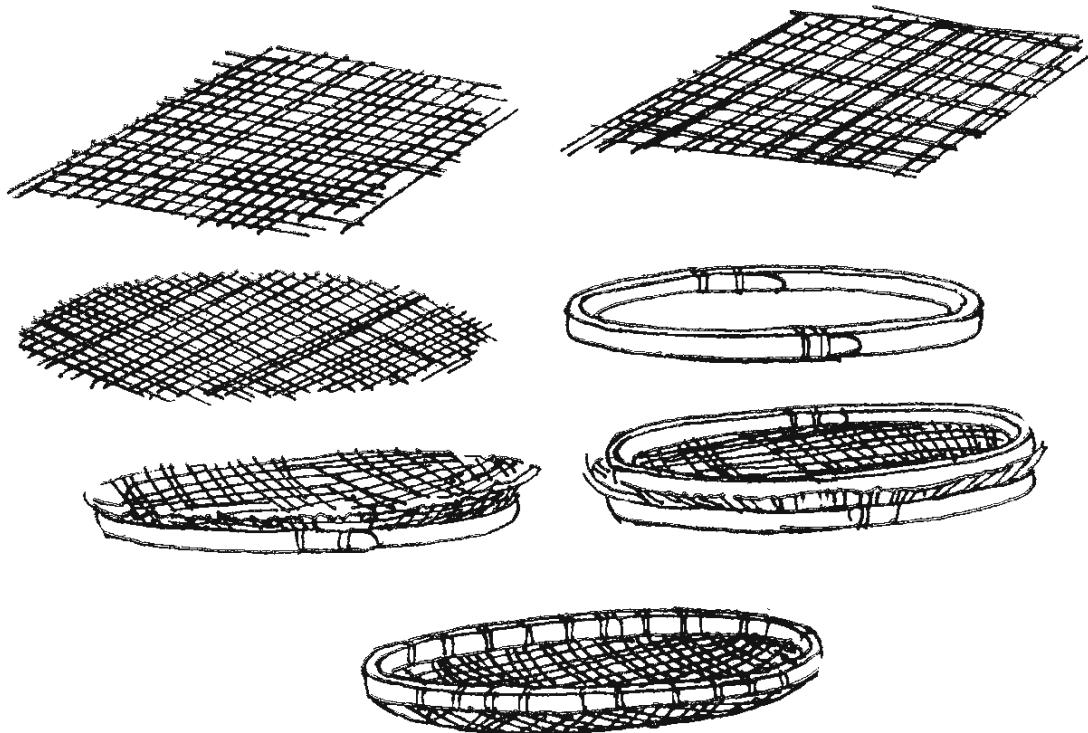


বাণিজের পাতি সিঙ্গ বিভিন্ন শিলিং কৈরি কারাই পদ্ধতি

পাঠ: ৭, ৮ ও ৯

চালা ও চালনি

চালা ও চালনি কৈরির পদ্ধতি একই রকম। চালার জন্য আবা ইঁকি চওড়া এবং চালনির জন্য এক সূতা বা সেক সূতা চওড়া পাতলা বাণিজের পাতি নিই। পাতিগুলো হবে বিশ একশুণ ইঁকি দৰ্শা। সূচো জিনিসই সাধারণত মূখ্যের পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হবে। চালা ব্যবহৃত হবে ঠাল বুননি দিয়ে, যেন কোনো ছিঁড় না থাকে আব চালনি মূলৰ পাতিতে, সরুকৰ যতো কীক রেখে। খেজুল রাখব দৰ্শা—সৰ্পি ও আড়াআড়ি উভয় দিকে পাতিতে পাতিতে বেন সমান কীক থাকে। বুনা পেৰ হলে চাক বা ক্রেম সাধারে হবে। চাকের জন্য এক খেকে সেক ইঁকি চওড়া, সাকে তিন হাত দৰ্শা পাতলা বাণিজের চটা নিয়ে আলো করে ঠেছে বুকের দিকটা সমান করে নিই। প্রত্যেকটি চালা বা চালনির জন্য এককম ধৰকোড়া টোক হয়েজন। চটাখুলোর দুয়াখা হয় সাত ইঁকি জাগুগা ঠেছে কুমে কুমে পাতলা করে দুই দিকে বাণাসভুব পাতলা করে নিই। প্রত্যেকটি চটার এক মাথা শির্ষের দিকে এবং অপর মাথা পেটের দিকে ঢাক্কে হবে। চালা পেৰ হলে একটি চটার পিট বাইজের দিকে ঝেখে আস্তে আস্তে বাঁকিয়ে গোল করে নিই এবং এক হাত ব্যাস ঝেখে সূর করে চেরাখুলো বেত দিয়ে বেঁধে একটি চাক কৈরি করি। বিভীষি চটার বুক বাইজের দিকে ঝেখে এভাবে আঝো একটি চাক কৈরি করি। প্রথম চাকের ঢেকে বিকীয় চাকের ব্যাস গোঁয়া ইঁকি কৰ হবে। চালা অৰবা চালনির কুনালো অল্পটি বাণাসভুব বড় ঝেখে লোল করে বৰটি এবং চালনিকে সমাপ্ত জাগুগা ঝেখে বড় চাকের উপর বসিয়ে ভাতে চেপে চাকের ডেকের কিছুটা সাবিজে নিই। অব্যাক গোটো চাকটি বড় চাকের তিক মাখাখানে এবং চেপে দেওয়া কুনালো অল্পের ফেলৰ বসিয়ে লোঁজে ঢেকে চেপে বসিয়ে নিই। হোট চাক বসাবাব সময় খেজুল রাখব এবং ঝোঁড়া বেন বাইজের বড় চাকের হোলার উপর দিকে পড়ে।

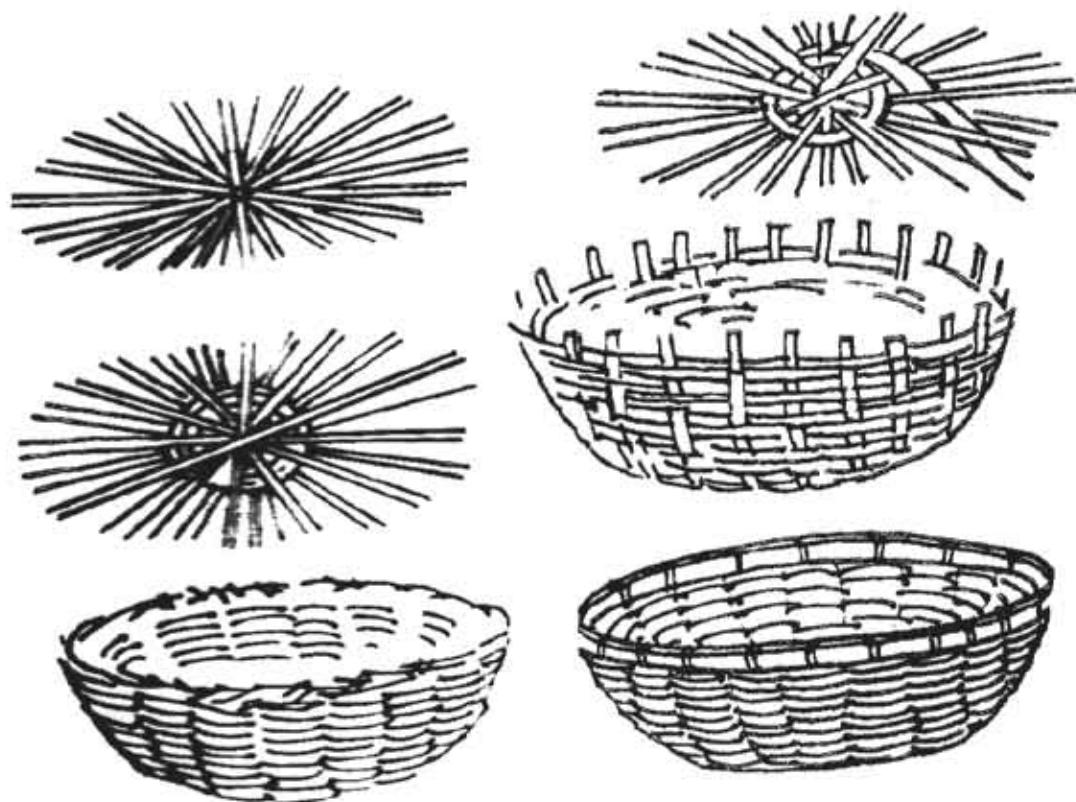


ডালা ও চালনি তৈরি করার পদ্ধতি

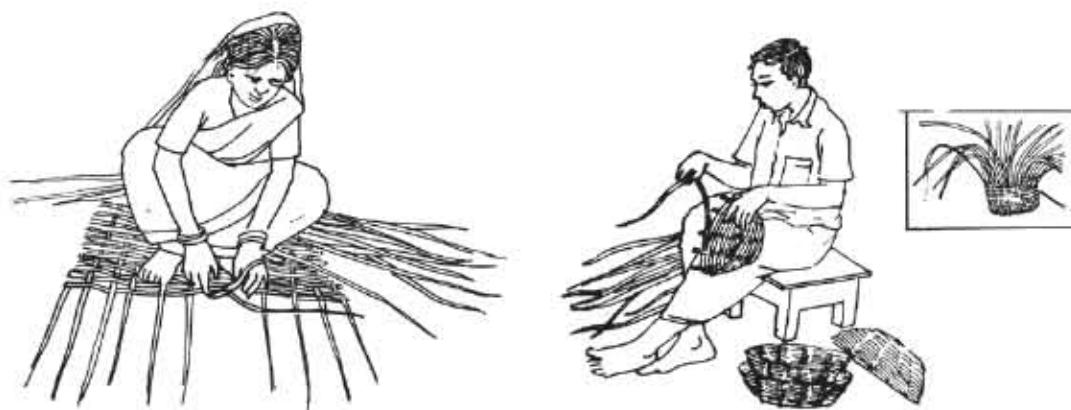
ছেট চাক বড় চাকের ভেতর মোটামুটিভাবে বসে গেলে চাকের উপরে বেরিয়ে থাকা বুননের বাড়তি অশ্ব ধারালো ছুরি দিয়ে বড় চাকের সমান করে কাটি এবং চেপে চেপে চাক দুটির মুখ সমান করে নিই। তিতরের চাকের বাঁধন কেটে দেই যাতে চাকটি প্রসারিত হয়ে বাইরের চাকের সাথে ঠিসে বসে যায়। চাক দুটির মুখের মাঝামাঝি কাঁকের উপর বাঁশের সরু একটি বেতি বসিয়ে বুননসহ চাক দুটিকে সরু করে চেরা জালি বেতি দিয়ে ক্রমান্বয়ে বেঁধে শেষ করে দেব। এবার আমরা যে কোনো মাপের ডালা, চালনি কিংবা এ ধরনের যে কোনো জিনিস তৈরি করতে পারব। গ্রামে অনেকেই খুব সুন্দর সুন্দর ডালা ও চালনি তৈরি করতে পারে। সুযোগ পেলেই আমরা তাঁদের কাজ দেখে নেব, তাহলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। জিনিসগুলো ছেট আকারে তৈরি করে আমরা খেলনা বা শখের জিনিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

বুড়ি

বুড়ির জন্য পাতি ও বেতি দুটোই ব্যবহার করতে হয়। আগেই জেনেছি, পাতি হয় চ্যাপ্টা ও পাতলা আর বেতি হয় লম্বা সরু পাতির চেয়ে পুরু। কমপক্ষে আধা ইঞ্চি চওড়া ও হাত তিনেক লম্বা বেশ কিছু পাতি নিয়ে নিচের ছবির অনুকরণে বৃত্তের মতো করে বসাই। সবগুলো পাতির মাঝামাঝি জাঙগাটা যেন কেন্দ্রে পড়ে। এবার লম্বা বেতি দিয়ে কেন্দ্রে বৃত্তের আকারে বুনে যাই। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে— একসাথে দুটি বেতি নিয়ে বুন আরম্ভ করতে হবে। ছবিতে লক্ষ করি প্রথম বেতি যে পাতির নিচ থেকে উপরে উঠছে হিতীয় বেতি তার পাশের পাতির নিচ থেকে উপরে উঠছে। বুনার সময় কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া পাতিগুলোকে প্রতিবা঱েই একটু একটু করে উপর দিকে টেনে দেব যেন বুন একেবারে সমতল না হয়ে পরিধির দিকে আসেত আসেত উপরে উঠতে থাকে।



বাল্পন পাতি মিঠে বৃক্ষ তৈরি করার পদ্ধতি



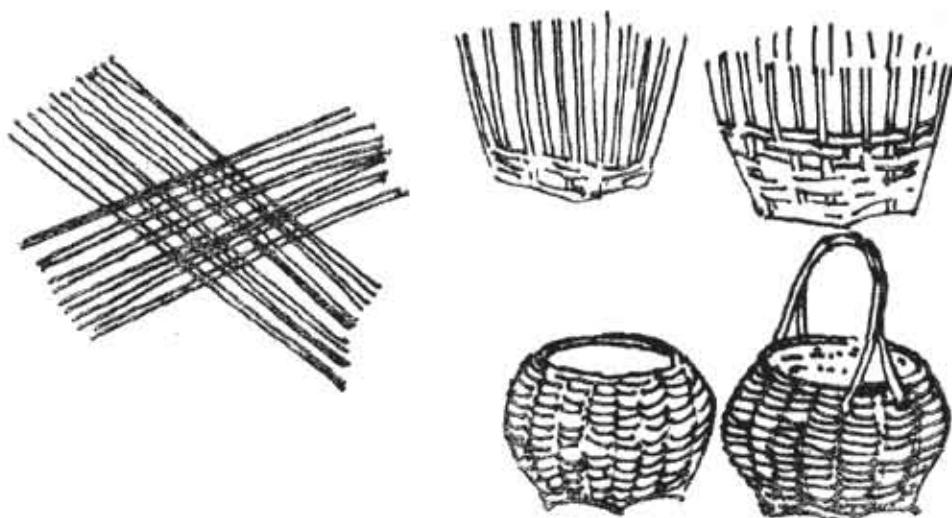
বাল্পন চাটাই ও বৃক্ষ তৈরি

বুনানো অঞ্চলের ব্যাস আট নয় ইঞ্জি হয়ে গেলে আজো কিছু পাতি নিয়ে আগের পাতিগুলোর খালে ঝালে আগের যতোই
কুকুর আকাশে কসাই এবং সমতলভাবে বেতি দিয়ে ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে বুনে থাই। করেক শাইন বুনার পর সমূর্খ জিনিসটি
উচিতে কসাই এক পাতিগুলো উপরের দিকে টেনে টেনে বেতি দিয়ে বৃত্তাকাশে বুনে থাই। খেজাল রাখব বুনন যেন

সমতল সা হয়ে আসে উপরের সিকে উঠে শেষ পর্যায়ে খাড়া হয়ে উঠে। এবার খাড়া হয়ে যাওয়া পাতিগুলোর দুই ইঞ্জির ঘণ্টা বাঢ়তি অথবে কুন্দল শেষ করে থাই। পাতির বাঢ়তি অল্প ঠাই করে বৃক্ষিয়ে পরিবিহ সাথে সমাজরাজতাবে পেটিয়ে বেংখে নিই। ইঞ্জি খানেক চওড়া ও প্রজোজনমতো লম্বা দৃঢ়ি বাশের চটা নিয়ে ঠাই হিলে চাকের অন্য তৈরি করি। এখন কুকেয়ে সিকে যুখোমুখি করে বৃক্ষিয়ে বাইতে কেভেয়ে বালিয়ে শক্ত করে বেংখে নিই। এই পদ্ধতিতে আফ্যা ছেট ছেট খেলনা বৃক্ষিয়ে তৈরি করতে পারি, তবে তার অন্য বেংখি, পাতি, চটা সব কিছুই সরু ও গাঢ়া হতে হবে যাতে খেলনা বৃক্ষিয়ে আকাশের সাথে খাপ খাব।

খালই

খালই তৈরির জন্য ধীর আধা ইঞ্জি চওড়া ও দুই হাত লম্বা পাতি ও লম্বা সরু বেংখির অঞ্জলি। নিচে ইঞ্জি ঘণ্টো পাতিগুলোর মাঝে পোয়া ইঞ্জি করে কৌক অথবে সাক আট ইঞ্জি চওড়া করে লম্বালম্বিতাবে কসাই। এই একই পাতি আড়াআড়িতাবে ব্যবহার করে লম্বালম্বি পাতিয়ে যাবাখালটায় বুলে বাই। কুমাণো অল্প লম্বা চওড়ায় সমাপ্ত হয়ে পোলে এই কুন্দল শেষ করি। এবার এক খোড়া লম্বা বেংখি নিই। কুমাণো অংশের এক কোণা থেকে বেংখি এক ধীপ্ত সিয়ে বৃক্ষিয়ে কুন্দলের মাঝে বী সিক থেকে ভাস সিকে কুন্দলে আরও করি। কুন্দল বিশীয় কেবল পর্যন্ত মৌজে পোলে সমৃৎ জিমিসচি বী সিকে চুরিয়ে কসাই। বাসের অংশটি উপরের সিকে টেনে খুলে নিয়ে বেংখিগুলো কুন্দলের সামনের অল্প সূলে জোড়ে টেনে নিই। এবার বী সিকের কোণে সামনের ও বাসের পাতি দূর্দিল নিয়ে সিকে লম্বালম্বিতাবে চুরিয়ে সূলে নিই এবং অক্ষেকুটি কোণের পাতিগুলোকে পাতে পাতে লাগিবে নিই। সূই ফিল লাইস টেনে কুন্দল পর আর টানকুনা, এবার থেকে বাইজের সিকে সামান্য টেনে টেনে পর পর দুসারিত করে সূলে বাই।



বাশের পাতি দিয়ে খালই তৈরি করার পদ্ধতি

খেয়াল রাখব কুন্দলের সময় খাড়া পাতিগুলোর মধ্যেকার কৌক বেন সমান থাকে। খাড়া পাতির যাবামাবি পর্যন্ত হসাইত হয়ে উঠার পর কুন্দলের সময় বেংখি একটু টেনে খালইয়ের সিকে কুম্প ছেট করে বুনি। পাতি দুই ইঞ্জি বাঢ়তি অথবে কুন্দল শেষ করি। পাতির বাঢ়তি অংশটুকু মুখের সমাজরাজতাবে কেভেজের সিকে কৌক করে সরু বেংখি দিয়ে পেটিয়ে বাধি। খালই মোটামুটি তৈরি হলো। এবার আধ ইঞ্জি চওড়া ও একধৰ্ম বাশের চটা নিয়ে খালইয়ে মুখের যাথে একটি চাক তৈরি করে উপরের সিকে বসিয়ে সূলের করে বেংখে নিই।

বাকি রইল হাতল। লম্বা, মাঝারি ধরনের মোটা একই মাপের দুই খণ্ড জালি বেত নিই। একই পাশ থেকে ছিলে প্রত্যেকটির দুই মাথা আধা ফালি করে নিয়ে ছবির মতো খালইতে সাগিয়ে সরু চেরা বেত দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নিলেই খালই তৈরি শেষ হলো। দৈনন্দিন জীবনে খালই যেমন ব্যবহার হয় তেমনি শখের জিনিস হিসেবে ছোট ছোট খালই তৈরি করে ঘরে রাখতে পারি।

পাঠ: ১০, ১১ ও ১২

মূর্তি ও বেতের কাজ

মূর্তি ও বেত আমাদের দেশে সব জায়গায় পাওয়া যায়। কোথাও কম কোথাও বেশি। সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মূর্তি ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এসব স্থানে পাটি, মূর্তার ও বেতের তৈরি চাটাই এবং নকশা করা মাদুরও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। সিলেটের পাটি দেশ - বিদেশে বিখ্যাত।

মূর্তার ব্যবহার উপযোগী অংশটি সাধারণত পাঁচ ছয় ফুট লম্বা। এর মধ্যে কোনো গিট থাকে না। উপরিভাগ শক্ত মসৃণ, কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ। তেতরের অংশ সাদা ও শোলার মতো নরম। মূর্তার উপরের শক্ত ও মসৃণ অংশটুকু কাজে লাগে, নরম অংশ ফেলে দিতে হয়। পাটি, মাদুর, চাটাই কিংবা অন্যান্য যেকোনো জিনিস তৈরি করতে গেলেই মূর্তা এবং বেত ছিলে পাতি তৈরি করে নেব। ছোট-বড় বিবেচনা করে প্রথমে মূর্তা ও বেতকে লম্বালম্বি চার থেকে আট ফালি করে চিরে নেব। বুকের নরম অংশটা সাবধানে চেঁছে ফেলে দিব, যেন বুকের সাথে পিঠের শক্ত অংশ কাটা না পড়ে।

এই অবস্থায় পাতি যথেষ্ট পুরু রয়েছে এবং বুকের সাদা নরম জিনিসটি আর্থিকভাবে থেকে গিয়েছে। এবার বাঁশের একটি খুঁটির সাথে পেঁচিয়ে বুকের দিক উপরে রেখে পুরু পাতিগুলোকে আগাগোড়া টেনে নিই যাতে বুকের দিকটা কেটে গিয়ে মসৃণ পিঠের দিকটা সমতল হয়ে যায়।

এভাবে পাতিগুলোর বুক ফাটানো ও পিঠ সমতল হয়ে গেলে বুকের দিকটা আবার ভালো করে চেঁছে নিই। দেখি পাতিগুলো বেশ পাতলা হয়ে গেছে। প্রয়োজনবোধে আবার লম্বালম্বিভাবে চিরে সরু করে নেব। চাটাই ও মাদুরের জন্য এই পর্যায়ের পাতি ব্যবহার করা হয় কিন্তু পাটির জন্য আরো সূক্ষ্ম পাতির প্রয়োজন। ভালো পাটি তৈরির উপযোগী পাতি তৈরি করা শিখতে দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। পাতি তৈরি করার পর দুই তিন দিন পানিতে দুবিয়ে রেখে আবার একটু শুকিয়ে নিয়ে কাজে লাগাব। মাদুর ও পাটিতে বুনে নকশা করার জন্য রঙিন পাতি ব্যবহার করতে হয়। মূর্তার মসৃণ পিঠের দিকে রং ধরতে চায়না যে পাতিতে রং করব তা চেরার আগে মূর্তার পিঠের মসৃণ স্তরটা খুব হালকাভাবে চেঁছে নেব। পাকা রং পানিতে গুলে পাতিগুলো কয়েক ঘণ্টা দুবিয়ে রেখে রং করব। পাটি অথবা মাদুরের জন্য সাধারণত লাগের সাথে সামান্য সবুজ মিশিয়ে মেরুন রং ব্যবহার করা হয়। মূর্তা ও বেতের পাতি তৈরি ও রং করার কথা জানলাম। এবার কয়েকটি জিনিস তৈরি করি। প্রথমে চাটাই দিয়েই আরম্ভ করি।

চাটাই

মূর্তার চাটাই শোয়া, বসা, বিছানার নিচে পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। শহরবাসীদের মধ্যে এই চাটাইর ব্যবহার বেশি না থাকলেও গ্রামে-গাঙ্গে, মফস্বলে এটা খুবই প্রচলিত। একটু চেষ্টা করলে আমরা চাটাই তৈরি করতে পারব।

চাটাই ছোটও হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। এর জন্য আয়তনের অনুপাতে প্রয়োজনীয় লম্বা ও আধা ইঞ্চির মতো

চওড়া পাতি নেব। বুননের সময় প্রয়োজনবোধে পাতির মাথার উপর নতুন পাতি বসিয়ে জোড়া দিয়ে আরো লম্বা করতে পারি। মূর্তির পাতি একটু চওড়া হলে সাধারণত তার গায়ে লম্বালম্বি থাকে। যাতে চাটাই মোলায়েম হয় ও দেখতে ভালো লাগে। দুধারা পদ্ধতিতে চাটাই বুনতে হয়। চতুর্দিকে দেড় খেকে দুই ইঞ্চি পাতি বাড়তি রেখে বুনন শেষ করি। এবার পাতির বাড়তি অংশ নিচের দিকে একটি একটি করে তাঁজ সরু করে চেরা পাতি বেত দিয়ে বেঁধে নেব। একে চাটাইর মুড়ি বাঁধা বলে। উপরের ছবিতে মুড়ি বাঁধার পদ্ধতি দেখে নিই। বাঁধানোর বেত কীভাবে চালাতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ করি।

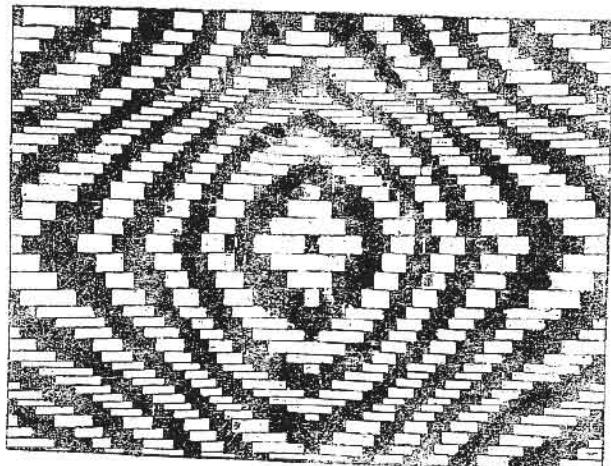
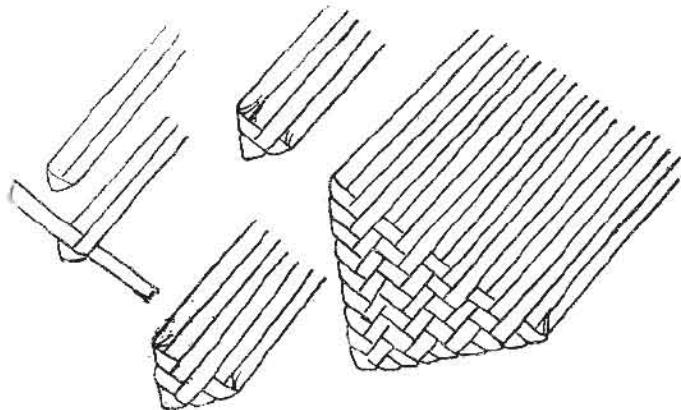
মাদুর

চাটাই তৈরি শেখার পর মাদুরে হাত দিই। মাদুর সাধারণত শোয়া ও বসার জন্য ব্যবহার করা হয়। নকশা করা সুন্দর সুন্দর মাদুর জ্যানামাজ হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর নকশা করা মাদুর আজকাল শহরবাসীদের সমাদর লাভ করেছে। মাদুরের জন্য দেড় সূতা পরিমাণ চওড়া পাতলা পাতির প্রয়োজন। বুনে নকশা করার জন্য রঙিন পাতিও লাগবে। রং ছাড়া পাতি লম্বালম্বিভাবে সাজিয়ে রঙিন পাতি আড়াআড়ি বসিয়ে নকশার প্রয়োজনমতো এক ধারা, দুধারা, তেখারা ইত্যাদি পদ্ধতি মিলিয়ে বুনে যাই। বুনন শেষ হলে মুড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে মুড়ি বেঁধে নিই। চাটাইর মুড়ি বাঁধার জন্য যে বেতের ফালি ও সরু বেত ব্যবহার করেছি, মাদুরের জন্য তার চাইতে সরু ফালি ও বেত ব্যবহার করব। এবার আমরা আমাদের জন্য ছোট বড় মাদুর তৈরি করতে পারব।

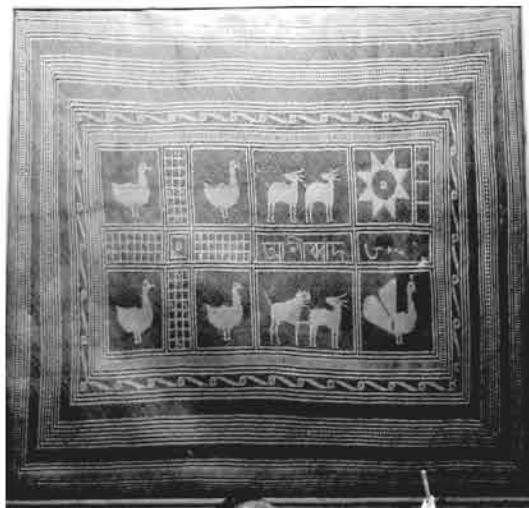
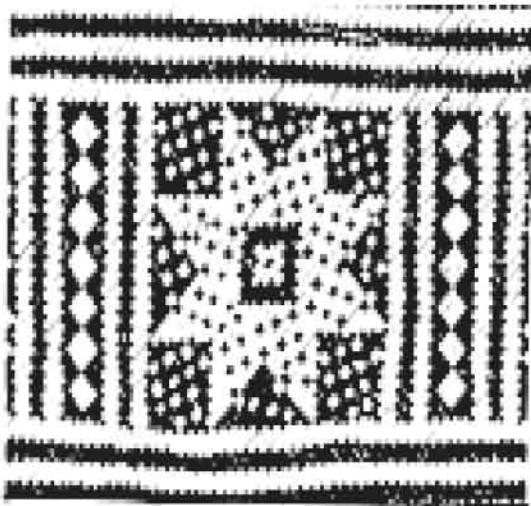
পাটি

মূর্তির তৈরি জিনিসের মধ্যে পাটির কদর সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বিছানার উপর পেতে শোয়া খুবই আরামদায়ক। এতে গরম কম লাগে বলে পাটিকে শীতলপাটিও বলা হয়। ভালো পাটি বিশেষ করে সুন্দর নকশা করা পাটিও তার জন্য সুস্থ পাতলা পাটি তৈরি করতে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। এখন আমাদের পক্ষে এ কাজ করা কঠিন। তবুও অতি সাধারণ পাটি বুনার পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা নিয়ে রাখছি।

শেখার জন্য মাদুর তৈরির উপযোগী পাতি দিয়ে পাটি বুনার চেষ্টা করতে পারি। পাটি বুনতে চাটাই বা মাদুরের মতো লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে আলাদা আলাদা পাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বুননও লম্বা বা চওড়ার দিক থেকে আরম্ভ করতে হয় না। পাটির বুনন আরম্ভ হয়ে এক কোণ থেকে এবং একই পাতি তাঁজ হয়ে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি পাবার প্রয়োজনবোধে লম্বালম্বি থেকে আড়াআড়িভাবে চলে যায়। এতে পাটির চারদিকে বাড়তি পাতি থাকে না, আপনা থেকেই মুড়ি বস্থ হয়ে যায়, চাটাই বা মাদুরের মতো মুড়ি বাঁধার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে একটি পাতি নিয়ে ছবিতে দেখানো নিয়মে তাঁজ করি। আরেকটি পাতি নিয়ে ছবি দেখে প্রথমে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দুদিক তাঁজ করে লম্বালম্বি দিকে নিয়ে যাই। তাঁজ করার সময় লক্ষ রাখবে পাতির পিঠ যেন সব সময় উপরের দিকে থাকে। তার জন্য দুবার ঘুরিয়ে তাঁজ করতে হবে। এবার তৃতীয় পাতি নিয়ে অনুরূপ ভাবে বুনে যাই। একটা জিনিস খেয়াল করি এ পর্যন্ত বুননের সময় পাতি প্রথমে আড়াআড়ি বসিয়ে তাঁজ করে লম্বালম্বি করা হয়েছে। বুননের সাথে সাথে পাটির লম্বা ও চওড়া দুদিকেই সমানভাবে বাড়ছে। পাটি চওড়ার চেয়ে লম্বা বেশি হয়। পাটি প্রয়োজনমতো চওড়া হয়ে গেলে এবার লম্বালম্বি পাতি তাঁজ করে আড়াআড়ি করব। আবার প্রয়োজনবোধে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি করব। পাটির লম্বা দিকের একপাশ প্রয়োজনমতো লম্বা হয়ে গেলে পাতি তাঁজ করে করে বুনে বাকি অংশটা শেষ করব।



চাটাই তৈরি করার প্রাথমিক পর্যায়



নকশা করা পাতি

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

টাই ও ডাই

উপকরণ : কাপড়, সূতা, আলপিন, সেফটিপিন, নুড়ি, ছিপি, বোতাম, ধান, সোডা (কাপড় কাচার), লবণ, চা চামচ, বড় চামচ, রং, বোল বা বাটি, গুড়ো মাপাবার নিষ্ঠি, কেরোসিন স্টেভ, কাপড় ধোবার চাড়ি বা ডাবর, বালতি, বাটিক ফাস্ট কালার, ডাইলন রং, ইস্ত্রি ইত্যাদি।

টাই ও ডাই প্রণালিতে প্রস্তুত মনোমুগ্ধকর কারুশিল্প বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পদ্ধতিতে কাপড়ের মধ্যে রং লাগিয়ে আকার, রূপ, রং ও নকশা সৃষ্টির দ্বারা এমন মনোরম কারুশিল্প সৃষ্টি করা যায় না। আধুনিক জীবনের জটিলতাজনিত টানাপোড়েনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানুষ ক্রমশই সৃজনশীল গৃহ নৈপুণ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সেই হেতু বস্থন ও রঞ্জন প্রণালির কারুশিল্প বিশেষভাবে ভাব সঞ্চারী আবেদন সৃষ্টি করেছে, কারণ এটি একটি সুন্দর শিল্প। এই প্রণালিতে প্রস্তুত কারুশিল্প আকর্ষণীয়তায় এবং ব্যবহারোপযোগিতায় অনন্য। ‘বস্থন–রঞ্জন’ প্রণালিতে রঞ্জিত কাপড় বা চিন্তাকর্মণ ও মনোহরণে অপূর্ব, তা দিয়ে কাপড়, গলাবন্ধ, বুমাল, উড়না, চাদর, কুশন, পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড় ইত্যাদি হরেক রকম গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা যায়। ‘বস্থন ও রঞ্জন’ প্রকৃত অর্পে এটাই বুঝিয়ে থাকে। কাপড়কে বাঁধা হয়। তাঁজ করা হয়। সেলাই করা হয়, গেরো দেওয়া হয় অথবা অন্যভাবে আবদ্ধ করা হয়, যাতে করে কাপড়ের সম্পূর্ণ অংশ রঞ্জন পাত্রে দুবালে তাঁজ করা অংশে রং প্রবেশ করতে না পারে এবং রঞ্জিত ও অ-রঞ্জিত কাপড় মিলে একটি সুন্দর এবং বর্ণাত্য নকশার সৃষ্টি হতে পারে। ‘বাটিকে’ কাপড়ের অংশ বিশেষ রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম দ্বারা লেপন করা হয়। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা রঞ্জন করার প্রতিটি পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় নকশা, সহজ বা জটিল কারুশিল্পকে অসীম সুযোগ এনে দেয়। বস্থন ও রঞ্জন এবং বাটিক ফাস্ট কালার (বাটিক রং) প্রশিয়ান রং ও ইস্ত্রিগো রং ব্যবহৃত হয়, তা ছাড়া ‘ডাইলন কোল্ড ওয়াটার ডাই’ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; কারণ এতে কাপড়ের রং পূর্ণরূপে পাকা হয়, বহুবার লান্তিতে ধোয়ানো হলেও রঞ্জের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় না।

বাটিকের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

- ১। একটা মসৃণ সমতল কাঠের টেবিল। (একে ট্রেসিং টেবিল বলা হয়)
- টেবিলের মাপ অনুসারে কাঠের টুকরা উপরে থাকবে।
- মোমের কাজ করার জন্য একটি কাঠের মসৃণ এবং সমতল টেবিল দরকার। এটি যেন খবরের কাগজ বা শক্ত হার্ডবোর্ড দিয়ে ঢাকা থাকে। এররকম টেবিলে মোমের কাজ করা ভালো।
- গ্যাসের/কেরোসিনের চুল্লি (স্টেভ)।
- এলুমিনিয়াম বা হাতলযুক্ত পাত্র।
- রঞ্জন (Resin) এবং চাক মোম (মৌচাকের মোম)।
- ব্লক এবং ব্রাশ (মৌচা, চিকন)।
- একটা কাঠের তৈরি ফ্রেম। এর সাহায্যে নকশাতে মোম লাগাতে সুবিধা হবে। তার আগে কাপড়কে ফ্রেমে আটকাতে হবে। (কাজ করার সময় সতর্ক হয়ে কাজ করা দরকার)।

- ৮। কাপড়ের নকশা আকার জন্য পেনসিল, কার্বন কাগজ এবং মাঝারি শক্ত পেনসিল ।
- ৯। বালতি বা টব। (এনামেল বা প্লাস্টিকের) ।
- ১০। রং মেশাবার জন্য ছোট আকারের স্টিলের পাত্র বা প্লাস্টিকের গামলা ।
- ১১। মেজারিং সিলিন্ডার (মাপার যন্ত্র)। এর সাহায্যে তরল পদার্থকে মিমি. ও লিটারে মাপা যায়। (কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি) ।
- ১২। রাবার বা প্লাস্টিকের শীট ।
- ১৩। হাতের ফ্লাইস বা দস্তানা। (এটি পাতলা রাবারের তৈরি)
- ১৪। প্রাতন খবরের কাগজ। (কাজ করার জায়গা ঢাকার জন্য)
- ১৫। বড় এবং ছোট আকারের প্লাস্টিকের চামড়া ।
- ১৬। বাটিক প্রিন্টের জন্য উপযুক্ত ধর্মবে সাদা সুতি কাপড় ।

বাটিকের কাজ

এ কাজে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামও খুবই সুলভ ও সাধারণ। রঞ্জন ক্রিয়া আগাগোড়া ঠাণ্ডা পানিতেই সম্ভল করা হয়, তবে আলগা রং উঠিয়ে ফেলার জন্য সবশেষে পাঁচ মিনিটের জন্য ফুটন্ট পানিতে চুবিয়ে রাখতে হয়।

বর্ম্মন ও রঞ্জনের পর কাপড় ভালোরূপে ধুইয়ে ভালো করে ইস্ত্রি করতে হবে। পেনসিল দিয়ে নকশা এঁকে নিতে হবে, নমুনাটি সুই-সুতা দিয়ে বখেয়া ফৌড় দিয়ে সুতা টেনে বাঁধতে হবে, রং করতে হবে, ধুইয়ে নিতে হবে। অথবা নকশা ছাড়াও সাধারণভাবে বেঁধে নিলেও হবে। এছাড়া বিভিন্ন কোটার মুখ বা অন্যান্য জিনিস ভিতরে বাঁধা যায়।

রং করার পদ্ধতি

১ টিন রং=১০ গ্রাম, ১/৩ আউল্স অথবা ২ বড় চা চামচ; ৪ বড় চামচ লবণ=আনুমানিক ১১২ গ্রাম অথবা ৪ আউল্স; ১ বড় চামচ সোডা= আনুমানিক ৪২ গ্রাম অথবা ১.৫ আউল্স।

উল্লেখিত জিনিস ২০ আউল্স পরিমাণ তরল রং তৈরি করতে হবে। স্বল্প এবং অধিক পরিমাণের জন্য রং, লবণ ও সোডা উপরে বর্ণিত অনুপাতে নিতে হবে। ১ টিন রং এক পাউন্ড পানিতে দ্রবণ করতে হবে। নাড়াচাড়া করতে হবে। ৪ বড় চামচ সাধারণ লবণ এবং ১ বড় চামচ সাধারণ সোডা এক পাউন্ড গরম পানিতে দ্রবণ করতে হবে নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ঠাণ্ডা করতে হবে। যখন নমুনা প্রস্তুত হবে, কিন্তু তার আগে নয়, সলিউশন দুটি মিশ্রণ করতে নমুনাটি ভিজানো এবং ১.৫ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত রং করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।

যখন রং করা শেষ হবে, তখন নমুনাটি পাত্র থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং পানি না শুকানো পর্যন্ত চিপড়াতে হবে। ফুটন্ট পানিতে নমুনাটি ঢেকে রাখতে হবে (সিঙ্ক এবং উলের জন্য গরম পানি) মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে; এইভাবে পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। উন্নতমূল্পে পানি দারা পরিষ্কার করা এবং শুকানো, একত্রিত করে এবং পানি দারা পরিষ্কার করতে হবে। যখন নমুনা একত্রিত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয়বার গরম পানিতে ধোত করা উত্তম। শেষবার ধোত

করার পর নমুনাটি ইস্তি করতে হবে, তাতে ভাঁজের দাগ এবং আর্দ্রতা দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রঙে রঞ্জিত করতে হলে পয়েন্টে বাঁধতে হবে। পয়েন্ট পূর্ণ কর্ম্মন করে এইভাবে সজ্জিত করতে হবে যেন বাঁধানোর বাইরের অংশ প্রয়োজনীয় রঙে রঞ্জিত হতে পারে। দ্বিতীয় রঙের জন্যও রঞ্জন প্রক্রিয়া একইভাবে করতে হবে। নমুনাটিকে একত্রিত করার জন্য গেরো বাঁধার সুতা কেটে ফেলতে হবে।

একবার সোডা মিশ্রণ করলে রঞ্চি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। রং যদি প্রয়োগের কিছু পূর্বে মিশ্রণ করতে হয়, তবে রঞ্জের সলিউশন এবং লবণ ও সোডার সলিউশন দুটি আলাদাপাত্রে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি সমপরিমাণে মিশ্রণ করতে হবে। ছিপি খুব এঁটে লাগালে এই রং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। ডাইলন কোল্ড ওয়াটার ডাই কাপড়, সিলেন, ডিসকোস, রেয়ন, সিঙ্ক এবং উল্লের জন্য আদর্শ রঞ্জক।

বন্ধন ও রঞ্জনের কলাকৌশল

গ্রন্থি বা গেরো পরীক্ষার জন্য একটি গ্রন্থি বাঁধতে হলে দেখতে হবে এতে কতটুকু কাপড় লাগে, গ্রন্থির অবস্থা চিহ্নিত করতে হবে।

১নং প্রণালি : একটি কাপড় লম্বালম্বিভাবে অর্ধেক করে তাঁজ করতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং প্রথম চিহ্নিত স্থানে একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। প্রদর্শিত গ্রন্থির ন্যায় ফাঁক ফাঁক করে গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

২নং প্রণালি : কাপড়ের একটি স্বল্পতম নির্দিষ্ট অংশ তুলতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। নমুনার পরিকল্পিত স্থানে আবার ঐরূপ করতে হবে। যদি কাপড়ের আয়তক্ষেত্রের মধ্যভাগে গ্রন্থিটি বাঁধা হয়, তবে প্রত্যেক কোণে অন্য গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

সকল প্রণালির জন্য : গ্রন্থিগুলো এঁটে বাঁধতে হবে এবং প্রথম রঞ্চি দিতে হবে পুনরায় গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে এবং দ্বিতীয় রঞ্চি দিতে হবে। পরে পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। গরম পানিতে ধুয়ে শুকাতে হবে। স্ক্রু ঘুরানোর ন্যায় গ্রন্থিগুলো প্রত্যেক পার্শ্বে পাকিয়ে একত্রিত করতে হবে। গ্রন্থিগুলো তখন একত্রিত করার পক্ষে বেশ আলগা ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। পরে ধুয়ে শুকাতে হবে।

সকল প্রকার বাঁধনের জন্য শক্ত সুতা, নাইলন সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। লম্বালম্বিভাবে কাপড় জড়ে করা অথবা তাঁজ করতে হবে। সুতোর এক পার্শ্বে গেরো দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরের সমূ বাঁধন দিতে হবে। ডোরার উপর শক্ত বাঁধন দিতে হবে। তাড়াতাড়ি বেঁধে বা উপরোক্ত তিনি প্রকারের মিশ্রণ গেরো বেঁধে, শক্ত করে বাঁধতে হবে এবং রং করতে হবে। রং করার পূর্বে আরও রং যোগ করা যায় অথবা গ্রন্থি পরিবর্তন করা যায়।

চতুর্থেকাণ : এক প্রস্থ মিহি কাপড় চার ভাঁজ করে তারপর তাকে একটি ত্রিভুজাকারের রূপ দিতে হবে। সবগুলো বেঁধে পরে রং করতে হবে।

মার্বেল রং : ছোট নমুনা নিয়ে কাপড় হতে গুচ্ছ করতে হবে। সুতার গ্রন্থি বাঁধতে হবে। একটি শক্ত বর তৈরি করার জন্য এটিকে সব স্থানে বাঁধতে হবে।

টেবিলের উপর কাপড় স্টান করে রাখতে হবে। কাপড়ের এপাশে ওপাশে কাজ করে এবং কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশ ফাঁক করে গোলাকৃতি করতে হবে যাতে করে পাড়ে ভাঁজ পড়ে। কাজ করার সময় একটি আলগা বাঁধন দিতে হবে। যখন সমস্ত কাপড় গুচ্ছাকৃতি হয়ে যায় তখন একটি শক্ত গুচ্ছ তৈরির জন্য আরও বাঁধন লাগাতে হবে উভয় প্রণালির জন্য

প্রথমে রঞ্চি দিয়ে ধূয়ে ফেলতে হবে এবং একত্রিত করতে হবে। কাপড় পুনরায় বিন্যস্ত করে বাঁধতে হবে এবং দ্বিতীয় রং লাগাতে হবে।

একত্র কাপড় বন্ধন

ছোট ছোট জিনিস যেমন নৃত্তি, ছিপি, বোতাম, ধান ইত্যাদি কাপড় গ্রন্থিত করা যায়। এদের অবস্থান পেনসিলের সাহায্যে ‘ডট’ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথম ‘ডটে’ কোনো একটি জিনিস কাপড়ের তেতর রেখে এবং এর চারপাশে সূতা দিয়ে বাঁধতে হবে। সুতাটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এবং পরবর্তী ‘ডট’ কেও যথাস্থানে বাঁধতে হবে।

এর উপর একটি আলগা গ্রন্থি বাঁধতে হবে। এপাশে ওপাশে কাজ করার সময় প্রত্যেকটি জিনিস ইইভাবে বাঁধতে হবে অথবা মধ্যভাগ থেকে বহির্ভাগের দিকে বাঁধতে হবে।

পরিবর্তন : বন্ধন-স্থান এক টুকরো ‘পজিথিন’ দিয়ে ঢেকে ডবল করে বাঁধতে হবে। একটির উপর আর একটি বাঁধতে হবে। জিনিসটিকে ঢেকে একটি খৌপার মতো করে উপরের দিকে বাঁধতে হবে। পরে রং দিতে হবে।

বৃত্ত কাপড়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে দিতে হবে। একটি ছোট বৃত্তের জন্য কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশে সূতা ঢারা বেঁধে অপেক্ষাকৃত বড় একটি বৃত্তের জন্য আরও সামনের দিকে অনুরূপভাবে বাঁধতে হবে। নির্দিষ্টস্থানে ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধন দিতে হবে। বাঁধন দৃঢ় করে পরে রং করতে হবে। অন্য রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ

আকৃতির মধ্যভাগ বরাবর কাপড় তাঁজ করে ভাঁজের বিপরীতে অর্ধেক ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। পেনসিলের লাইন বরাবর ‘সেফটিপিন’ ঢারা বুনন করতে হবে। পিন আটকানো, পিনের নিচে সূতা দিয়ে বাঁধানো পিন সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনমতো পাখার আকৃতি বিশিষ্ট নমুনা বেঁধে দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক আকৃতির জন্য এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। পরে রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

পাঠ: ১৬ ও ১৭

বাটিক

উপকরণ : ট্রেসিং পেপার, জলরং তুলি (নং ২ ও ৩), পোস্টার কাগজ, তেলরঙের তুলি (নং ৪ ও ৮) লাল ও সাদা মোম, লবণ, সোডা (কাপড় কাচা), এলজিনেট (গুঁড়া জাতীয় আঠা), কাপড় ফিটকরী, সোডিয়াম নাইট্রেট, সালফিটেরিক এসিড, মনোপল সপ, কস্টিক সোডা নেপথল রং (বাটিক রং), ফাস্ট কালার (বাটিক রং), পুশিয়ান রং, ইভিগো রং ইত্যাদি।

বিঃদ্র: নতুন কাপড় প্রথমে ব্যবহার করার পূর্বে সাবান দিয়ে ধূয়ে ইস্ত্রি করা একান্ত প্রয়োজন।

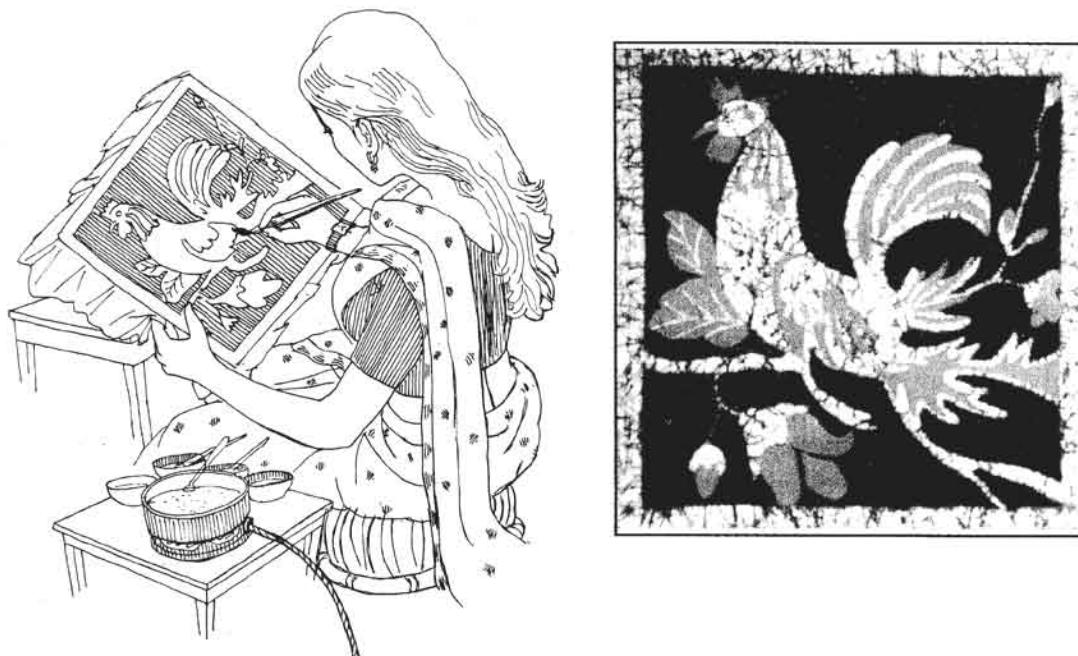
বাটিক সৃষ্টিশীল কাজের অন্যতম মাধ্যম। এর ইতিহাস বা উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। তবে বাটিকের উৎপন্নি সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এর প্রচলন প্রাচ্য দেশসমূহে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বালি ও তঙ্গলং দেশসমূহে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বর্তমানে এ সকল দেশে বাটিকশিল্প এক শৌরবময় ঐতিহ্যের সূচনা করেছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ সকল দেশ হতে বাটিকশিল্প ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে অনেক দেশে বাটিক কাজ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশেও বাটিকের কাজ বর্তমানে

বেশ দেখা যায় দেশের সর্বত্রই এর প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ উন্নয়ন প্রকল্পের গবেষণায় বাটিক কাজ করে আছেন। আর কেউবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই শিল্পকে ব্যবহার করছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে বাটিক কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়, যথা— (১) Neptol color (২) Procion color (reactive dyes)

প্রথমে বাটিক উপযোগী নকশা অঙ্কন করে পরে ট্রিসিং পেপারের সাহায্যে নকশা কাপড়ে উঠাতে হয়।

নেপ্টল রং করার প্রণালি : বাটিক কাজ করার পদ্ধতিতে ধারাবাহিক পৌচ্ছি স্তর রয়েছে। তা জেনে নির্দেশ।



মোম বাটিকের ছবি

প্রথম স্তর : প্রথম পর্যায় নকশা অনুযায়ী কাপড়টিতে দেখানে রং ব্যবহার করা হবে সে অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশে 'মোম-গরম করে তৃপ্তি দিয়ে নকশার স্থান কাপড়ের উভয় পার্শ্বে লাগাতে হবে (স্বতন্ত্রভাবে কাপড়ে মোমে আবৃত করা স্থানে রং লাগবে না)। রং করার পূর্বে ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত কাপড়টি তিজিরে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তর : নকশা করা কাপড়টি রং মিশ্রিত পানিতে প্রথমে পাত্রে ও পরে দ্বিতীয় পাত্রে ২-৩ মিনিট রাখার পর একই প্রক্রিয়ায় বার বার চুবাতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় চুবালে রং পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

তৃতীয় স্তর : নকশা অনুযায়ী রং করার পর পুনরায় অন্য রংগের ব্যবহারের জন্য ও এই রংটি রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে মোম দারা একই পদ্ধতিতে কাপড় আবৃত করে পাত্রে চুবাতে হবে। মনে রাখতে হবে একই প্রক্রিয়ায় বারব্বার পাত্র পরিবর্তন করে চুবানো হয়। এভাবে কাপড়ে অনেক প্রকার রংগের ব্যবহার করা যায়।

চতুর্থ স্তর : কাপড়টি রোদহীন ঠাণ্ডা জাগায় একটানা ১২ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাতে হবে।

পঞ্চম স্তর : অন্ন ক্ষারযুক্ত সাবান ফুটস্ট পানিতে মিশ্রিত করে কাপড়টি অতি যত্নসহকারে সেই পানিতে ৪-৫ মিনিট কাপড়টি রাখার পর ছায়ায় শুকাতে হবে। এইভাবে Nepthol color process-এ বাটিক প্রিস্ট হয়ে থাকে।

মোম তৈরি করণ : সম-পরিমাণ প্যারাফিন মোম (সাদা মোম) ও ভিউ মোম (লাল মোম অর্থাৎ মৌমাছির মৌচাকের মোম) একত্রিত করে ব্যবহার করতে হয়।

Nepthol color process-এ রং করার সূত্র :

(কাপড়ের রঙন অনুপাতে)

প্রথম পাত্র

দ্বিতীয় পাত্র

(Impregnating bath)

(Developing bath)

Salt রং এর বেশায়

বিশগুণ পানিতে

বিশগুণ পানিতে

নকশায় মোম লাগানোর নিয়ম

নিয়ম -১	নিয়ম - ২	নিয়ম - ৩
সাদামোম -২ ভাগ	সাদামোম - ৬ ভাগ	মধুমোম -২ ভাগ
মধুমোম ১ ভাগ	রঞ্জন - ৩ ভাগ	সাদামোম -১ ভাগ
রঞ্জন (এন প্রেড)-১ ভাগ	মধুমোম -১ ভাগ	রঞ্জন(এন প্রেড)-১ ভাগ

মোম গলাবার পদ্ধতি

একটা স্টিলের তৈরি বাটিতে প্রথমে মধুমোম গলিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা করার পর তার সঙ্গে সাদা মোম মেশাৰ। এটা গলে যাবার পর রঞ্জন গুড়া মেশাৰ। সাদামোম পাত্র চুলার উপর রাখা অবস্থায় স্টিলের হাতা বা বড় চামচ দিয়ে নাড়ব। এইভাবে নেড়েচেড়ে অন্যান্য নোঞ্জা জিনিসগুলো চামচ দিয়ে ফেলে দিব। মোম গলে গলে নকশায় মোম লাগাব। যখন পরিষ্কার মিশ্রণটা পাওয়া যাবে তখন সেই গলিত মোমকে কাপড়ে ত্রাশের সাহায্যে লাগাব। অবশ্য তার আগে দেখে নেব মিশ্রণ থেকে বাদামি রঙের ধোয়া উঠছে কিনা, এই রঙের ধোয়া দেখতে পেলেই পাত্রটা চুলার উপর থেকে নামিয়ে ফেলব। চুলার তাপে পাত্র সরাসরি বসিয়ে মোম লাগাবনা। এতে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ বেশি তাপ লাগলে মিশ্রণ রং করার সময় কাপড় থেকে ঝারে পড়ে যেতে পারে।

(ক) Nepthol-As অথবা Branhol AS -3%

(খ) Fast Red salt-GL অথবা Branhol Salt-6%

(গ) মনোপল সপ অথবা TR Oil-3%

(ঘ) বলন-১২%

(ঙ) কস্টিক সোডা-১.৫%

শুধুমাত্র Base color এর কাজ করার সময় দ্বিতীয় পাত্র পরিবর্তন করতে হবে। যেমন-

বিশগুণ পানিতে।

(ক) ফিটকারী-৬৫

(খ) সোডিয়াম নাইট্রেট-৩%

(গ) সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)

অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCL)=3%

(ঘ) Fast Red KB-3%

Fast color বাটিক রঙের বিভিন্ন নামকরণ রয়েছে। যেমন- Fast color = Red KB. কেবল Nephthol-AS এর বেলায় প্রযোজ্য। কোনো ন্যাপথল, ব্রেনথল ইত্যাদির সাথে কোনো Salt বা Base যোগ করলে কী কী রং পাওয়া যায়, নিচের চার্টে তা জেনে নিই।

লাল=Naphthol	As+Fast Red Salt GL
লাল=Naphthol	As+Scarlet Salt GG
লাল=Naphthol	As-Fast Scarlet R
লাল=Naphthol	As+BS+Fast Red Salt R
লাল=Naphthol	As-TR+Fast Red Salt TR
লাল=Naphthol	As-BO+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Naphthol	As-RL+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Branthol	As+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	As+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	MN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Red KB Base
কমলা =Naphthol	AS+Fast Orange Salt GC Base
কমলা =Naphthol	AS+Fast Orange Salt GR Base

কমলা =Branthol	AS+Branchol fast Yellow GC
লাল=Branthol	AS+Branchol fast Orange GC Base
লাল=Branthol	AS+Fast Orange GR Base
লাল=Branthol	MN+Fast Orange GC Base
লাল=Branthol	CT+Fast Orange GC Base A
খয়েরি= Naphthol	AS-BO + Naphthol Red Salt B
খয়েরি= Naphthol	AS + Naphthol Garnet GBC Salt
খয়েরি= Naphthol	AS + Bardo Salt GP Salt
খয়েরি= Branchol	AS + Branchol Bardo CP Base
খয়েরি= Branchol	AS + Branchol Fast garnnet GBC Base
খয়েরি= Branchol	MN + Branchol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branchol	AN + Branchol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branchol	AN + Branchol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branchol	BN + Branchol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branchol	BN + Branchol Fast Bardo GBC Base
নীল = Branchol	AS + Branchol Fast Blue Salt B
নীল = Branchol	AN + Branchol Fast Blue Salt B
নীল = Branchol	BN + Branchol Fast Blue Salt B
নীল = Naphthol	AS + Fast Blue Salt BB
নীল = Naphthol	AS + Fast Blue Salt BR
নীল = Naphthol	AS-TR + Fast Blue Salt BR
নীল = Naphthol	AS-OL + Fast Blue Salt BB
হলুদ = Naphthol	AS-G + Fast Yellow Salt GC
হলুদ = Naphthol	AS-G + Scarlet Salt GC
হলুদ = Branchol	AT+Branchol Yellow GC Base

ব্রেনথল ও ন্যাপথলের সমতুল্য তালিকা

Branthol AS=Naphthol AS

Branthol MN=Naphthol AS-BS

Branthol AN=Naphthol AS-BO

Branthol PA=Naphthol AS-RL

Branthol NG=Naphthol AS-GR

Branthol BT=Naphthol AS-BL

Branthol RB=Naphthol AS-SR

Branthol FR=Naphthol AS-OL

Branthol GT=Naphthol AS-TR

Branthol DA=Naphthol AS-BS

Branthol FD =Naphthol AS-RG

Branthol AT=Naphthol AS-G

Branthol BN=Naphthol AS-SW

পুশিয়ান রং করার প্রণালি : এই পদ্ধতিটি Nepthol color process এরই অনুরূপ। তবে মোম তৈরিকরণ একটু ভিন্ন ধরনের। যথা—সাদামোম ৪ ভাগ+রজন ২ ভাগ+ লাল মোম ১ ভাগ একত্রিত করে ব্যবহার করব।

Procion Color Process—এর রং করা পদ্ধতি : প্রথম পাত্রে প্রয়োজনানুসারে রং (Procion) ও লবণ ৩০% ভাগ অঞ্চল পানিতে মিশ্রিত করব। দ্বিতীয় পাত্রে ২০ গুণ পানিতে প্রথম পাত্রের প্রস্তুত রং মিশ্রিত করে তেজা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়াচাঢ়া করব। অতঃপর কাপড়টি উঠিয়ে ৮% ভাগ সোডা (কাপড় কাচ) মিশিয়ে পুনরায় রং করা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়াচাঢ়া করব, এরপর ঠাণ্ডা পানিতে ধূয়ে ২৪ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাতে দিব। শুকনো কাপড়টি অতঃপর ভিজিয়ে ফুটন্ট পানিতে ৪-৫ মিনিট নাড়ালে মোমগুলো পৃথক হয়ে যাবে।

প্রয়োজনানুসারে কাপড় রং করতে হলে—

হালকা রং এর জন্য ১ তোলা থেকে ২ তোলা

মাঝারি রং এর জন্য ২ তোলা থেকে ৩ তোলা

গাঢ় রং এর জন্য ৩ তোলা থেকে ৪ তোলা

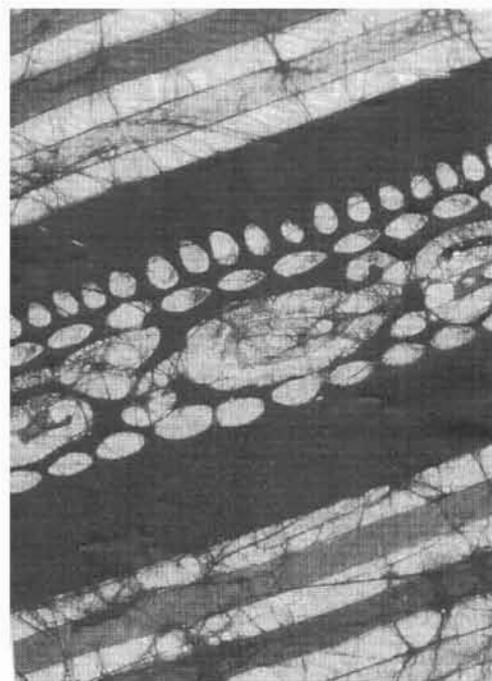
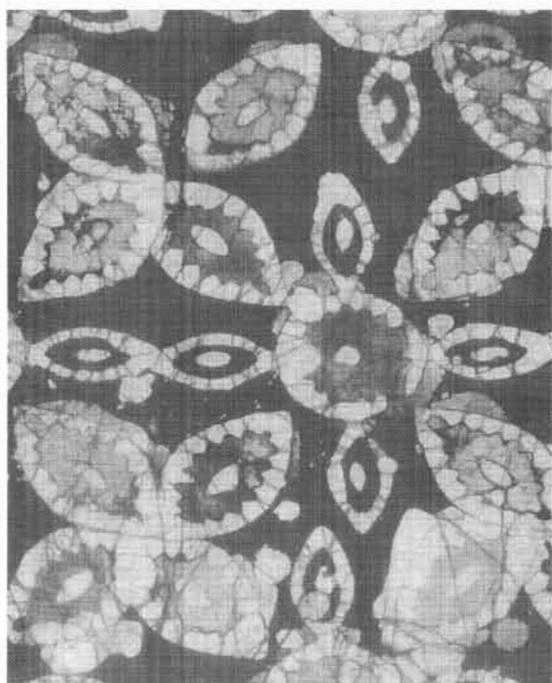
বি: দ্র: ১০০ তোলা কাপড়ের ওজনে।

পুশিয়ান রঞ্জের তালিকা : Blue M₂R, Blue M₃R, Red M₈B, Red M₅B, Yellow M₆G , Orange M₂R ইত্যাদি ।

Nepthol অথবা Procion color পদ্ধতি ছাড়াও বাটিক প্রিন্ট কাপড়টিতে নকশা অনুযায়ী সবুজ, নীল বা বেগুনি রং রাখতে হলে Cold Dying করার পূর্বে যেখানে যে রং ব্যবহার করা হয়, তা Pigment process এ করা হয়ে থাকে।

Pigment Process পদ্ধতি : বাজারে Indigo color বিভিন্ন রংের পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এক গজ কাপড়ের Pigment Process এর রং করতে হলে Indigo color সিকি তেলা নিতে হবে। $1/8$ ছাতক পানি ফুটিয়ে গরম অবস্থায় দূৰ্জনা ($1/8$ তেলা) সোডিয়াম নাইট্রেট মিশাতে হবে। পরে সিকি তেলা রং সোডিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত পানিতে ঠাণ্ডা করতে হবে অন্যদিকে আঠা Alginatate (গুড় জাতীয় আঠা) ক্ষুম গরম পানিতে ৫ মিনিট মিশালে আঠায় পরিণত হবে। অতঃপর প্রস্তুত Alginatate আঠা ঠাণ্ডা রংে মিশাতে হবে।

নকশা করা কাপড়টি প্রয়োজন অনুসারে ৯নং তুলি ব্যবহার করার মতো প্রস্তুত রং তুলি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের 'Indigo Color' নকশা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতঃপর রং করা কাপড়টি ২/১ চা চামচে সালফিটেরিক এসিড মিশ্রিত পানিতে নাড়ালে Indigo color এর থক্ত রং বেরিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিকে 'Pigment Process' বলে।



বাটিক প্রিন্টে ছাপা কাপড়

কাপড় ছাপা

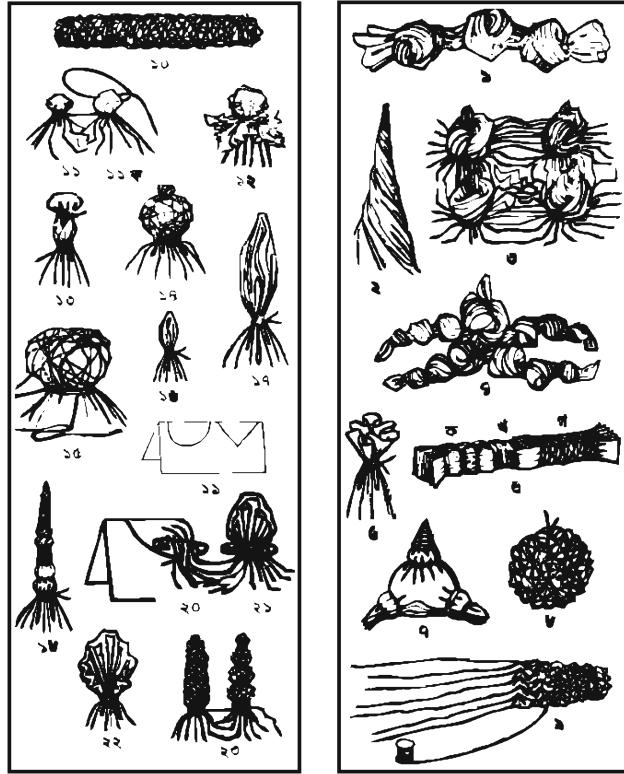
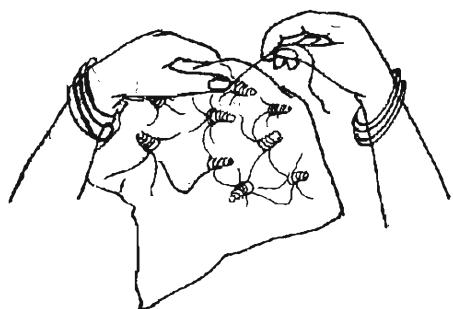
ছাপা কাপড় আমরা সবাই কমবেশি ব্যবহার করি। আমাদের পাঞ্জাবি, জামা, বিছানার চাদর, শাড়ি, মুক, পড়না ইত্যাদি রং-বেরঙের ছাপা কাপড় দিয়ে তৈরি করে থাকি। কাপড় ছাপার পদ্ধতি জানা থাকলে আমরা নিজেরাই আমাদের পছন্দমতো কাপড় ছেপে ব্যবহার করতে পারি।

ছাপার আগে কাপড়কে উপযোগী করে নিতে হবে, নইলে ভালো ছাপা বা রং ধরবে না। কোড়া কাপড় বা মাড় দেয়া কাপড়ে ভালোভাবে রং ধরে না। তাই কোড়া কাপড়ের ওজনের ১০ গুণ পানি নিয়ে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ তোলা সাবান, ২ তোলা কাপড় কাচা সোডা ও ৩ তোলা কস্টিক সোডা ২/৩ শষ্ঠা সিন্ধ করে প্রথমে গরম ও পরে ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে ধূয়ে নেব। খোলাই করা কাপড় হলে শুধু সাবান পানিতে ১৫/২০ মিনিট সিন্ধ করে ভালো করে ধূয়ে নিলেই কাপড় ছাপার জন্য তৈরি হয়ে গেল। এবার ছাপার পদ্ধতির কথা জানব-

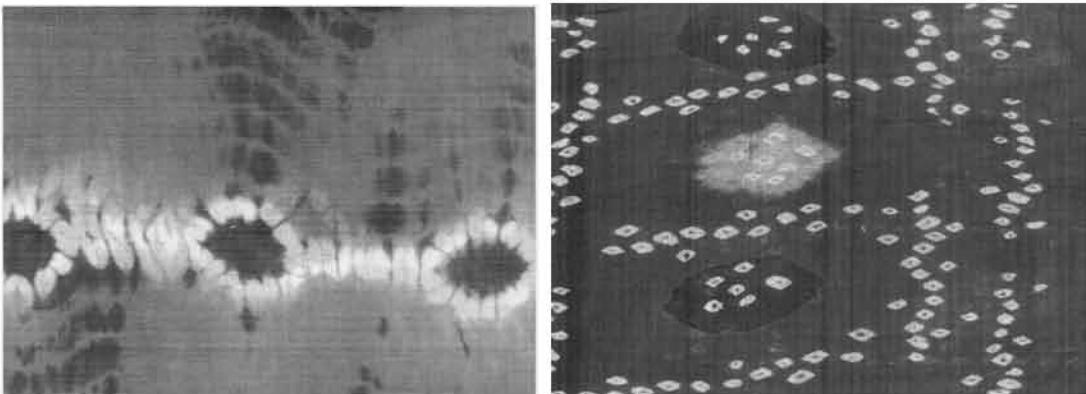
টাই এন্ড ডাই

সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে অথচ আকর্ষণীয় কাপড় ছাপার জন্য টাই এন্ড ডাই করা হয়। নামটা ইংরেজি। এর বাস্তু করলে হবে বাঁধা এবং রং করা। আমরা বহুল প্রচলিত টাই এন্ড ডাই নামটাই ব্যবহার করব। এ পদ্ধতিতে কাপড় বাঁধার জন্য শক্ত সূতা ও রং করার প্রয়োজনীয় জিনিস রাখব। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাপড়ের নির্দিষ্ট স্থানে সূতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রঙে চুবিয়ে অথবা রং টেলে নিলেই হবে। বাঁধা জায়গায় রং না দেগে এক ধরনের নকশার সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট কোনো নকশা না হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় নকশার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট নকশা করার জন্য সুই সুতার সাহায্য নেব। শাড়ি, লুঙ্গি অথবা অন্য কোনো কাপড়ে পরিমিত আকারে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, বরফি, ফুল পাতা বা অন্য কোনো নকশা কাপড়ে ঝঁকে নেব। এবার কাঁথা সেলাইয়ের ফোড় দিয়ে পার্শ্ব রেখা বরাবর সেলাই করে এবং সুতার দুই প্রান্ত আস্তে আস্তে টেনে নকশার তেতরের কাপড় লম্বা করে টেনে নেব। সেলাই পর্যন্ত সূতা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেব। বাঁধার সময় কিছু জায়গা ফাঁক থাকলে ভালো হয়। এভাবে সব কটি নকশা বেঁধে নিতে হবে। তারপর রঙে ধূবিয়ে নিয়ে নেড়েচেড়ে নিলেই হলো। একবার বেঁধে রঙে চুবালে এক রং, এমনিভাবে একাধিক রঙের জন্য কয়েকবার বেঁধে রঙে ডোবাতে হবে। প্রত্যেকবার বাঁধার আগে কাপড় ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নেব। একাধিক রং করার সময় হালকা রং থেকে শুরু করব।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো নকশা ছাড়াও বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঁধার মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও রুচিসম্পত্তাবে কাপড় ছাপানো যায়। এই পদ্ধতিতে কিছু বাঁধার নমুনার ছবি দেখে নিই।



টাইডাই করার পদ্ধতি

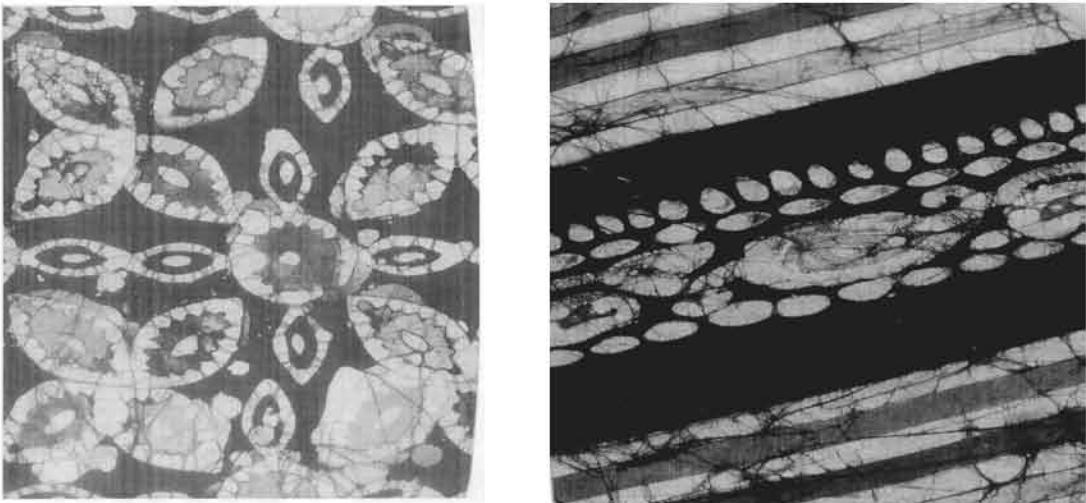


কাগড়ে করা টাই এন্ড ডাই

মোম বাটিক

উপকরণ : এই পদ্ধতিতে কাগড়ে নকশা করার নিয়ম অনেকটা টাই এন্ড ডাই পদ্ধতির মতো। অর্থাৎ নকশায় রং লাগতে না দিয়ে সমস্ত কাগড়ে রং লাগতে দেয়া। নকশায় যাতে রং লাগতে না পারে তার জন্য বিশেষ মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে বিভিন্ন রং করে শাড়ি, ড্রাইজ, বিছানার চাদর, পর্দা, জামার কাপড়, ওড়না ইত্যাদি নকশা করা যায়।

এই পদ্ধতিতে সুন্দর ছবিও করতে পারি। যাকে বাটিকের ছবি বলে। এক রঞ্জের বাটিক করতে সরাসরি কাগড়ের উপর শেনসিলে ছাই করে সেভাবে মোম লাগিয়ে রং করলেই চলবে। কিন্তু একাধিক রং হলে কাগজে রঞ্জিন নকশা একে নেব এবং পর্যাকরণে মোম করব। কার্বন কাগজের সাহায্যে কাগড়ে নকশাগুলো একে নিয়ে কাগড়ের সাদা অংশের দুপৰ্যাদেই মোম দিয়ে ঢেকে দিব। প্রথমে হলুদ রঞ্জে ছুবিয়ে ভালো করে রং করে নিই, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে সামান্য ধূয়ে শুকিয়ে আবার হলুদ নকশার অংশ মোম দিয়ে ঢেকে দিব। এরপর গুরুর মতো রঞ্জে ছুবিয়ে শুকিয়ে নিই এবং পরবর্তী হালকা রঞ্জের অংশ মোম দিয়ে ঢেকে দেই। সবশেষে গাঢ় বা কালো রং করতে হবে।



মোম বাটিকের কাজ

বাটিকের কাজে সব সময় ঠাণ্ডা রং ব্যবহার করতে হয়। টাই এন্ড ডাই এর মতো বাটিকের জন্য একই নিয়মে রং করতে হয়। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে রং তৈরির শিখন পদ্ধতি শিখে নিই।

এবারে বাটিকের মোম তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই। বাটিকের কাজের জন্য বিভিন্ন অনুপাতে দুই ধরনের মোম এবং রজন ব্যবহার করা হয়। পুশিয়ান রং দিয়ে বাটিক করার সময় কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে ছুবিয়ে রাখব, তা না হলে ব্যবহৃত মোম ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই রজন কিছুটা বেশি মেশাব।

মোম তৈরির অনুপাত জেনে নিই-

পুশিয়ান রঙের উপযোগী মোম

- | | |
|--|-------|
| ১। প্যারাফিন বা সাদা মোম আনুপাতিক হারে-৫০% | |
| ২। মৌচাকের মোম | -২৫% |
| ৩। রজন | - ২৫% |

পিতল বা এলুমিনিয়ামের পাত্রে চুলার খুব কম আঁচে মোম গলাতে হবে। রজন, মোম গলে ভালোভাবে মিশে গেলে চুলার আঁচ আরো কমিয়ে দিব। চুলার উপর রেখে নকশা করা কাপড়ে গোল কান্দাওয়ালা থালায় কাপড় লাগিয়ে মোম লাগাতে সুবিধা।

মোম লাগানো শেষ হলে পুশিয়ান বা ভ্যাট রঙে ছুবিয়ে রং করতে হবে। অধিক রঙের কাপড় আলতোভাবে ধূয়ে শুকিয়ে তারপর পরবর্তী মোম ও রং করব। এভাবে রং করা শেষ হলে কাপড় থেকে মোম তোলার জন্য একটা পাত্রে প্রয়োজনমতো গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাপড়খানি সিন্ধ করে মোম ছাঢ়িয়ে নেব। মোম ছাঢ়িয়ে পরিষ্কার পানিতে ধূয়ে ইস্ত্র করে নিলেই মোম বাটিক হয়ে গেল।

কাপড়ের রং তৈরি

কাপড়ের রং করার নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন। মোটামুটি তিনটি পদ্ধতির রং বাটিকে ব্যবহার করা যায়।

- ১। ভেট রং
- ২। পুশিয়ান রং
- ৩। ন্যাফথল রং

ন্যাফথল রং ব্যবহার একটু জটিল বিধায় শুধু ভেট রং ও পুশিয়ান রঙের পদ্ধতি জেনে নিই।

ভেট রং

একখানা শাড়ি বা সমপরিমাণ কাপড় রং করার জন্য নিচের পরিমাণে রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন-

$$\text{ভেট রং} = 1 \text{ তোলা}$$

$$\text{হাইড্রোসালফাইট এন এফ}= 8 \text{ তোলা}$$

$$\text{কস্টিক সোডা}= 8 \text{ তোলা}$$

রং করার আগে কাপড় কমপক্ষে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখব। এরপর পানি ঝারিয়ে নেব। পরে কাপড়ের পরিমাণে পাত্রে পানি দিয়ে তা চুলায় বসাব। রং ও রাসায়নিক দ্রব্যগুলো নেড়েচেড়ে ভালো করে মেশাব। পানি গরম হলে রংসহ জিনিসগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে ভেজা কাপড় এর মধ্যে ছুবিয়ে $15/20$ মিনিট সিন্ধ করব। কাপড় (টাই এন্ড ডাই)

বাঁধা অবস্থায় পরিষ্কার পানিতে ধূয়ে ফেলতে হবে। ছায়ায় রেখে শুকানোর পর খুব ভালো করে সাবান দিয়ে ধূয়ে ইস্ত্রি করব। তেট রং গরম করতে হয় বিধায় টাই এন্ড ডাই পদ্ধতির জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পুশিয়ান রং

একটি শাঢ়ি বা সমগরিমাণ কাপড়ের জন্য নিচের পরিমাণ রং, লবণ ও সোডার প্রয়োজন

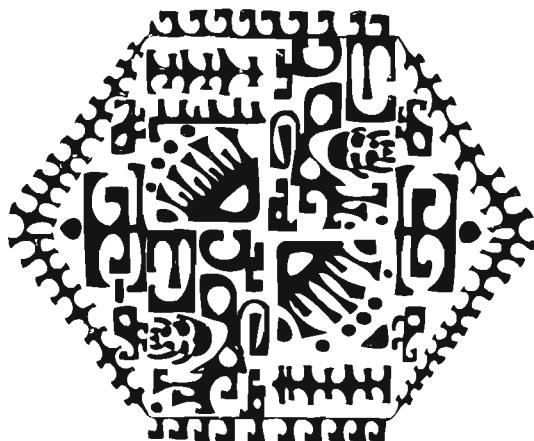
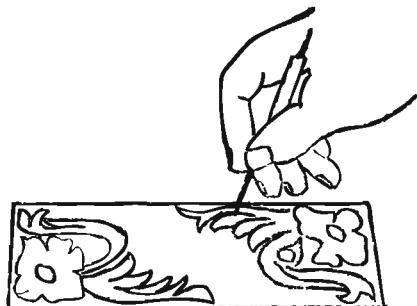
১। পুশিয়ান রং = ১ তোলা ২। লবণ = ৫ তোলা ৩। কাপড় কাচার সোডা= ১ তোলা

রং করার আধা ঘণ্টা পূর্বে কাপড় ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখব পরে কাপড়ের পরিমাণে পানিতে পরিমিত ১ তোলা লবণ মেশাব। এনামেলের পাত্রে সামান্য গরম পানিতে ৩/৪ ফোটা এসিটিক এসিড দিয়ে পুশিয়ান রং মেশাব। রং ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে লবণ মিশ্রিত পানিতে মিশিয়ে দিতে হবে এবং তাতে কাপড় ডুবিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখব যে কাপড়ের সর্বত্র রং লেগেছে কিনা। ত্রিশ মিনিট পর আরেকটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে সোডাটুকু গুলে নিব এবং দুবানো কাপড়ের রঞ্জের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সোডা মেশানোর পর আরো ত্রিশ মিনিট ডুবিয়ে রাখব। এরপর কাপড় তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে ধূয়ে চবিশ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাব। ভালো করে শুকানোর পর সূতার বাঁধনগুলো খুলে নেব তারপর সাবান দিয়ে ধূয়ে ইস্ত্রি করব। যে বাটিক পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা পানিতে রং করা হয় সে পদ্ধতি অনুসরণ করব।

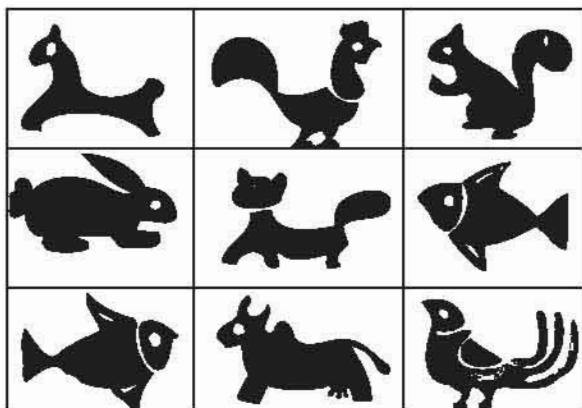
পাঠ : ১৮

ব্লক

কাঠে নকশা এঁকে নুরুন দিয়ে খোদাই করে করে ব্লক ছাপার জন্য ব্লক তৈরি করা হয়।



ব্লক প্রিস্টের নকশা



ত্রিক প্রিট



কাঠের ত্রিক

পাঠ : ১৯, ২০

কাঠ খোদাই শিল্প

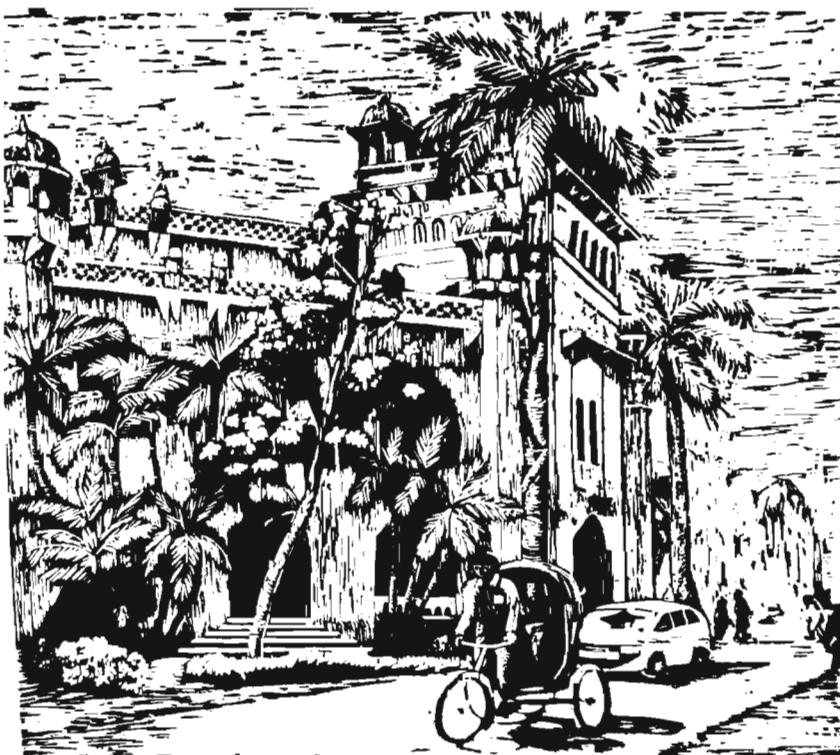
নরম কাঠের তক্ষার উপর অধিবৰ্ষ প্রাইটড নকশা এঁকে নুরুন দিয়ে খোদাই করে এটি তৈরি করতে হয়।

উপকরণ : হাতৃড়ি, বাটালি /Carving বাটালি / Round বাটালি, প্রাস, করাত, চিকন বাটালি, শিরীষ কাগজ।



কাঠ খোদাই করে ছাপচিত্র

শিল্পী : বুবাইয়া জামান রুবা



কাঠ খোদাই করে ছাপচিত্র

শিল্পী: সঞ্জীব কুমার পাল

পাঠ : ২১ ও ২২

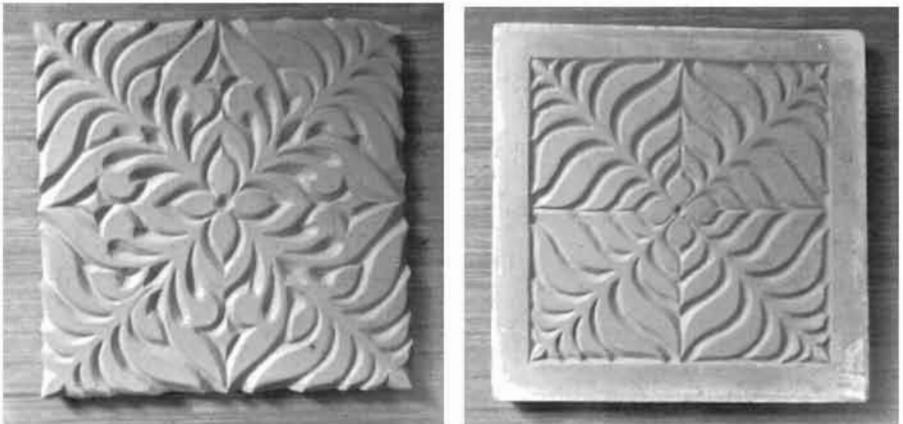
টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাতে বিশেষ করে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির দেয়ালে এ ফলকচিত্র ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা Terracotta হচ্ছে মাটির পাটাতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু হয়ে থাকে এমন রিলিফ ওয়ার্ক। এটা বানানোর জন্যে প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে ফলকগুলো তৈরি করে তারপর পুড়িয়ে নেয়া হয়। তাই এগুলোকে বলে পোড়ামাটির ফলক। বগুড়ার মহাস্থান গড়ে তথা প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের এবং দিনাজপুরের কাঞ্জীর মন্দিরের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু নর-নারী ও দেবদেবী। অন্যদিকে পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতির ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও নিসর্গের ছবি পাওয়া যায়, বাঘা মসজিদের বা টাঙ্গাইলের মদিনা মসজিদের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তুও ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতি নিয়ে টেরাকোটা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন অফিস ও বাসাবাড়ির আভাস্তরীণ সাজসজ্জা ও ভবনের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন প্রচুর টেরাকোটা ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটির ঢ্যাব তৈরি করে তাতে মাটি কাটার বিভিন্ন আকৃতির টুকুস দিয়ে খোদাই করে করে টেরাকোটা তৈরি করা হয়। মাটি দিয়ে তৈরি করে ছায়ায় রেখে কিছুদিন ভালোভাবে শুকাতে হবে। এরপর তুষের আগুনে পোড়াতে হবে। অথবা যাদের বাড়ির পাশে কুমার বাড়ি আছে তারা কুমার বাড়ির চুল্লিতেও পোড়াতে পারব। ছবি দেখে আমরা অতি সহজেই এগুলো বুবাতে ও করতে পারব।



মাটির ঢ্যাব (Slab) তৈরি করা



মাটির বশনচিত্র (টেরাকোটা)

পাঠ : ২৩ ও ২৪

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিখকর্ম

বিভিন্ন ইঁড়ি পাতিল ভাঙা টুকরা দিবে ছবি তৈরি

উপকরণ : ফেবিক আঠা, বিভিন্ন ইঁড়ি পাতিল এর ভাঙা টুকরা ইত্যাদি।

একটি প্রাইটেড এর টুকরা নিই। 2B পেনসিল দিয়ে প্রাইটেড এর উপর পছন্দযতো একটি ছবি আঁকি। এইবার প্রাইটেড এ ফেবিক আঠা লাগাই। বিভিন্ন ইঁড়ি পাতিলের টুকরোগুলোর মধ্যেও ফেবিক আঠা লাগাব। এরপর টুকরোগুলো নকশা অনুসারে খুব সাবধানে বসাব। নকশার বাইরে যে অংশ আছে সেখানেও অন্য ধরনের টুকরোগুলো ফেবিক আঠা দিয়ে লাগাব। এভাবে অতি সহজেই ফেলনা জিনিস দিয়ে আমরা একটি মোজাইক ছবি তৈরি করতে পারি। (ছবি দেখে অনুশীলন করি)



ইঁড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরা দিয়ে
শিক্ষার্থী জরুর আবেদনের প্রতিকৃতি

নমুনা প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুজ্ঞেদাটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উভয় দাও (বাঁশ ও বেতের কাজ)

একটি প্রাইটেড চিতি চ্যানেল কর্তৃক সংগঠিত বৈশাখী উৎসব উদযাপনের জন্য তারা এক বিরাট মেলার আয়োজন করে। সেখানে নানাভাবে দিনটিকে পালন করা হচ্ছিল। বৈশাখ মাসকে নানাভাবে বরণ-করা হচ্ছিল। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া তাদের মাঝের সাথে সেই মেলা দেখতে গেল। সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন জিনিসের স্টল দেখতে পেল। সেগুলোর মধ্যে যে জিনিসটি তাদের বেশি আকৃষ্ট করল তা হলো বাঁশ ও বেতের স্টল। তারা সেখানে বাঁশের ফুলদানি, ছাইদানি, চালন, ছেট ছেট ঘর সাজানোর খালই, পুতুল ইত্যাদি। তাছাড়াও বেতের শীতলগাটি, নকশিপাটি ইত্যাদি দেখল। উদয়ের কাছে এগুলো খুবই ভালো লাগল এবং মাঝের কাছে বায়না করল এগুলো কেবার জন্য যাতে তারা ঘর সাজাতে পারে। মা তাদেরকে বাঁশের দুটি পুতুল, ফুলদানি, ছেট খালই কিনে দিল। এগুলো পেয়ে তারা মনের আনন্দে বাসায় ফিরল। কিম্বতু দুঃখের বিষয় বাহাদেশে এগুলোর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

- ১। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া কার সাথে মেলায় গিয়েছিল?
- ২। ওরা বাঁশ ও বেতের কী কী জিনিস দেখল?
- ৩। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া বাঁশ ও বেতের জিনিস দিয়ে সাজিয়ে কীভাবে ঘরকে সুন্দর করতে পারে? উদ্দীপকের ভিত্তিতে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।
- ৪। ‘বালাদেশে এগুলোর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে’— কীভাবে এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়—তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

ব্যবহারিক (Activity)

- ১। বাঁশের একটি ফুলদানি তৈরি কর।

সৃজনশীল (কাঠের শিল্পকর্ম, টেরাকোটা)

রহিম ও রেজা একদিন তাদের বাবার কাছে বায়না ধরল তারা চারুকলায় যাবে। তারপর যেই কথা সেই কাজ। তাদের বাবা তাদেরকে চারুকলায় নিয়ে পেল। তারা সেখানে নানান ধরনের জিনিস দেখতে পেল। তারা সেখানে কাঠের ভাস্কর্য, শিল্পকর্ম, চিত্রকর্ম, উড়কার্ডি, পেইন্টিং, পাথরের ভাস্কর্য, টেরাকোটা, মোজাইক ছবি ইত্যাদি দেখল। রেজা খুবই অনুপ্রাণিত হলো এবং ভবিষ্যতে চারুকলায় পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করল। সবকিছু দেখে তারা ঘরে ফিরল।

- ১। রহিম ও রেজা তাদের বাবার সাথে কোথায় গিয়েছিল?
- ২। তারা সেখানে কী কী দেখল?
- ৩। কাঠ দিয়ে কী কী তৈরি করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ৪। কাঠ দিয়ে একটি ছোট পুতুল তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দিন।

- ১। টাই এন্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে নকশানুযায়ী প্রথমে—

ক. রং লাগাতে হয়	খ. পানিতে ডোবাতে হয়
গ. মোম লাগাতে হয়	ঘ. বেঁধে নিতে হয়

- ২। হলুদ, লাল, নীল এই তিনি রঙের টাই এন্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে প্রথমে ব্যবহার করতে হয়—

ক. লাল রং	খ. কালো রং
গ. হলুদ রং	ঘ. সবুজ রং

- ৩। মোম বাটিক পদ্ধতিতে রং করতে হয়

ক. রং বেশি গরম করে	খ. ঠাণ্ডা রঙে ঢুবিয়ে
গ. অল্প গরম করে	ঘ. ফুটন্ট গরম রঙে

মিল কর

বাঁশ দিয়ে	কাপড় রং করা যায়
পুশিয়ান রং দিয়ে	গরম মোম লাগাতে হয়
টাইডাই করতে কাপড়	বুড়ি, খালই তৈরি করা যায়
বাঁশের চটি বা শলা দিয়ে	ফুলদানি তৈরি করা যায়
বাটিক করতে কাপড়ে	সুতা দিয়ে বেঁধে নিতে হয়
বাঁশের অনেক সুন্দর	কাপড়ে এঁকে নিতে হয়
মাটির ফলকের	রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম লাগাতে হয়
নকশা ট্রেসিং করে	সামগ্রী তৈরি করা যায়
বাটিকে কাপড়ের অংশ বিশেষ	মাটি দিয়ে
ভেট রং দিয়ে	ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়
টেরাকোটা তৈরি হয়	কাপড় রং করা যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১) কাপড় রং করার পূর্বে কীভাবে কাপড়কে রং করার উপযোগী করতে হয় ?
- ২) টাই এন্ড ডাই এর রংকরণ পদ্ধতি লেখ ।
- ৩) মোম বাটিক কীভাবে করতে হয় ?

ব্যবহারিক (Activity)

- ১) একটি মাটির ফলকচিত্র তৈরি কর ।
- ২) টাইডাই পদ্ধতিতে একটি জামা তৈরি কর ।

ମହିଳା ଛବି

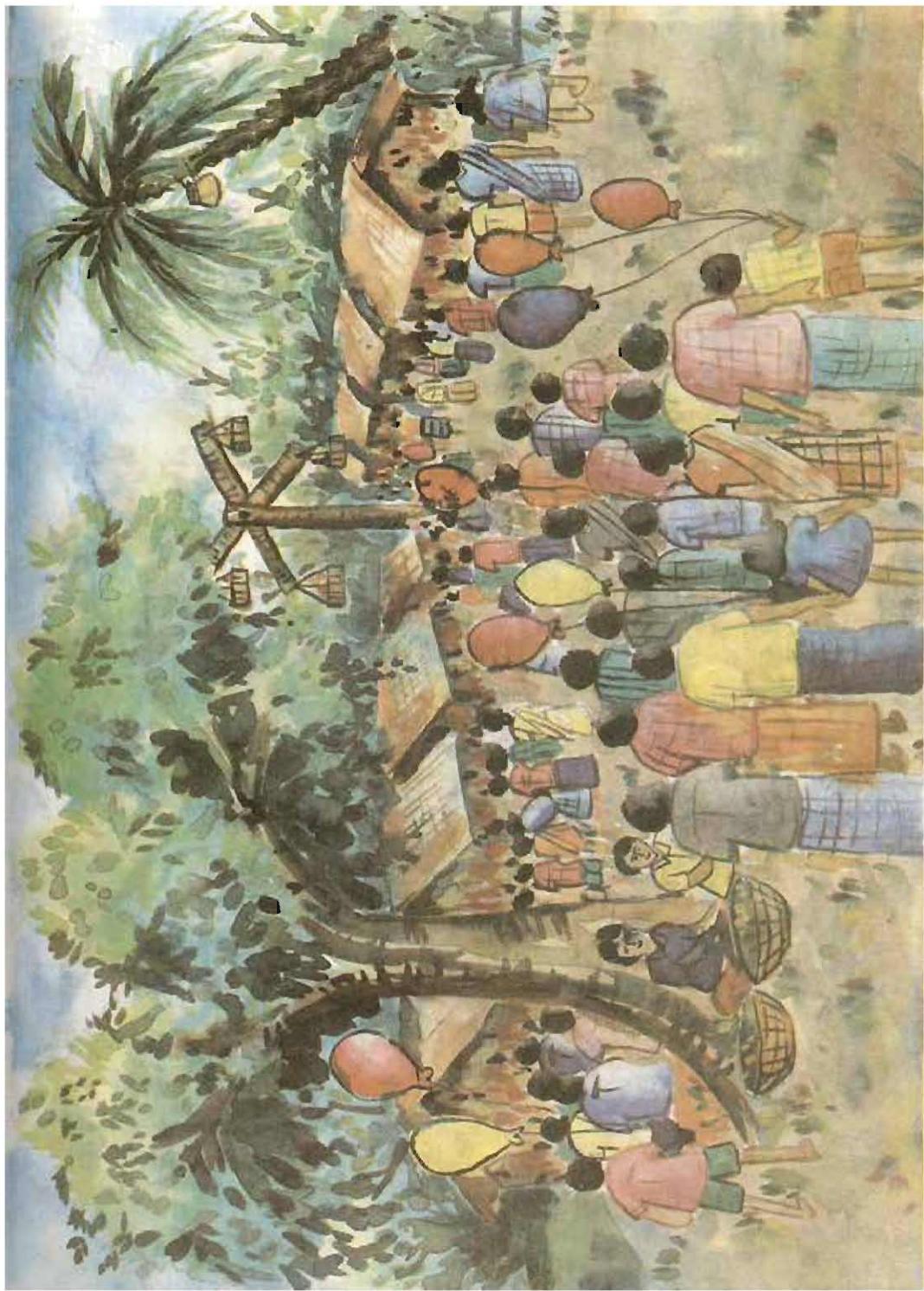


ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଛବି : ଶିଲ୍ପୀ ହାଶେମ ଖାନ

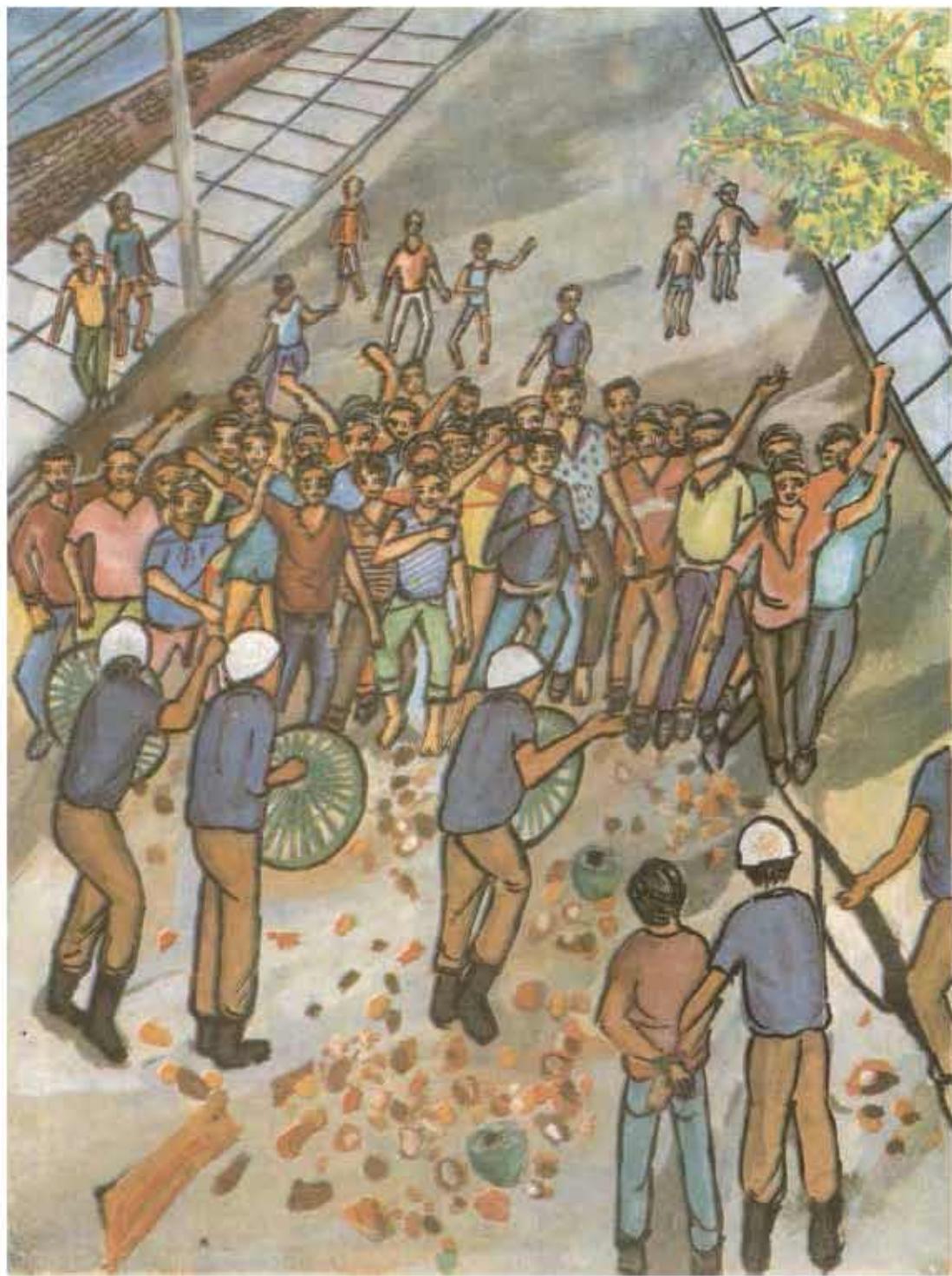
ମର୍ମା-୧୫ ଚାର ଓ କମ୍ବୁକା-୧୫-୧୦ୟ



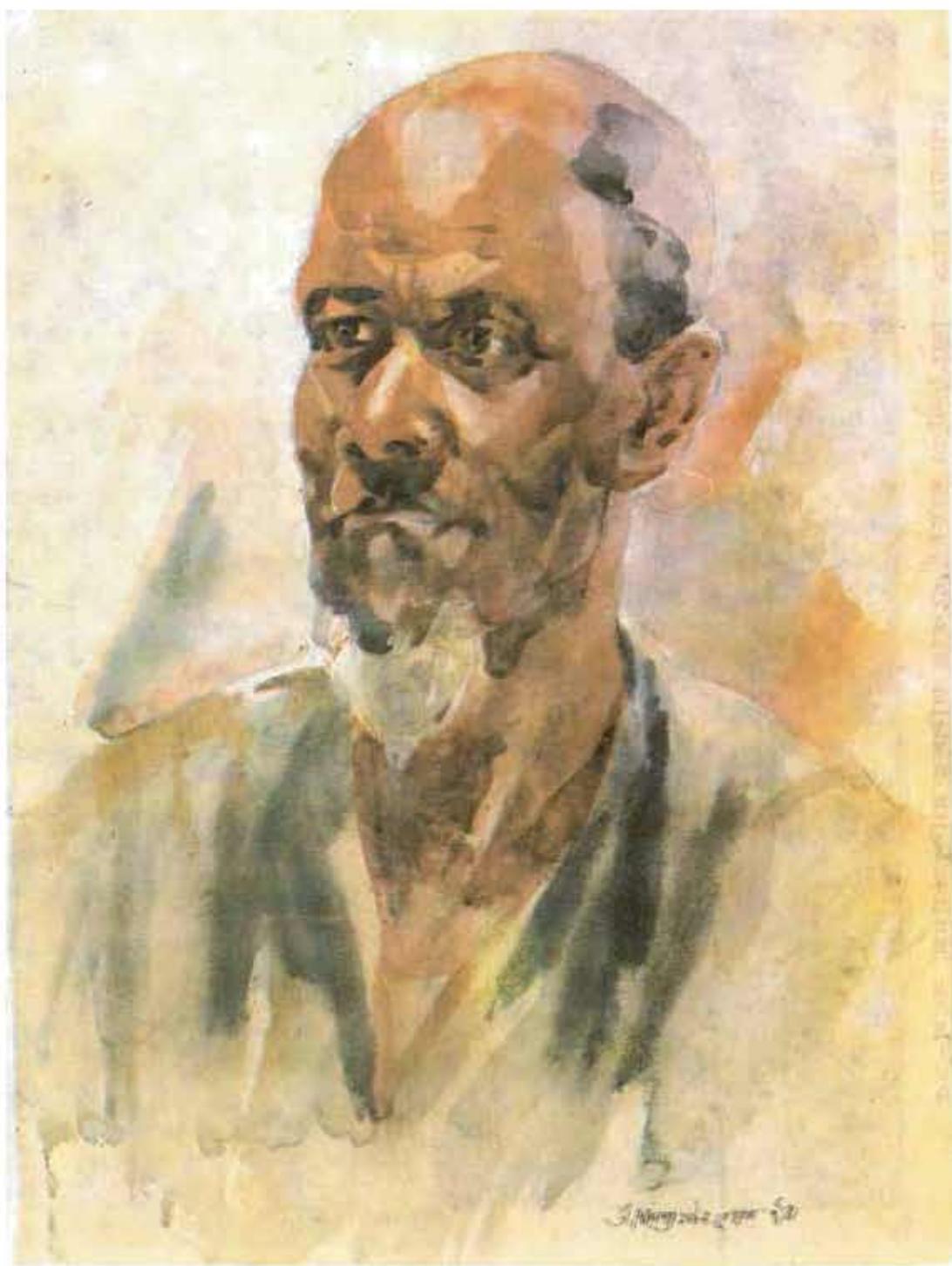
अमरावती 'यान्म' अन्तीमन, लिखी: सुखिन घायी



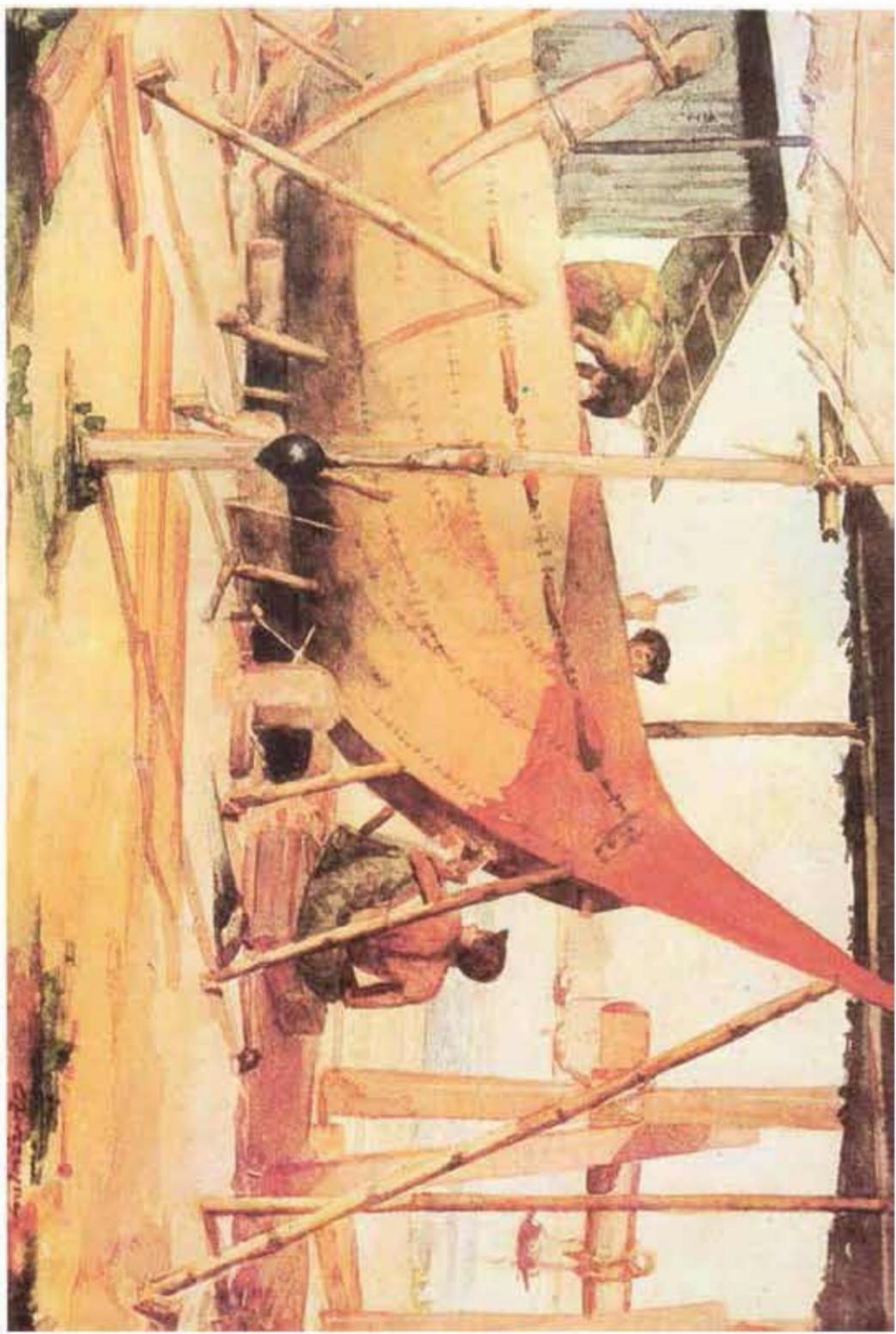
অশ্রুতে আকা 'মেলা' একেছে— মোঃ মিষ্টান্তুর রহমান রহমান, বয়স-১৪



ગોલ્ડાર રા. ઓ અનુષ્ઠાન કીર્તા 'આદાલત' ગીતકથે—ફૂલા દાખ મુખ્ય વરસ—૧૪



जगद्गुरु रवींद्रन 'गानधर मुख' शिष्यी : अलंगीम चूर्णम



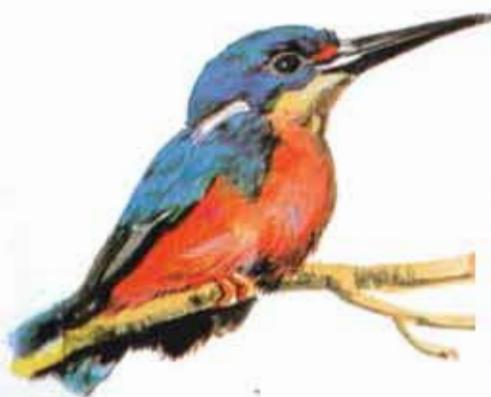
लोका चेति, अनन्त भगवान् योगी, शिल्पी : वामदेव मालार, गृहस्थान एव वर्तमान यज्ञ-१९६५



অসমের 'শিল্পিজি', একজন: অমা গোপীনাথ পাটোড়াৰী, ঘৰস-১৪



অসম বঙ্গের আধুনিক রংতে ছবিটি একেছে— অলিঙ্গা সাহা (অগী)



ଶିଳୀ ହାଲେମ ଖାଦ୍ୟ ପୌକ ଅଳକ ଓ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ତିଳ, ସାକ୍ଷାତ୍କର ମୁହଁଣୀ, ମାହାରାଜା, ଶାନ୍ତିକ ଓ ମୂର୍ଖ

ସମାପ୍ତ

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
১ম-১০ম চারু ও কারুকলা

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য 'ওওও' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য